

প্রশ্নের
ধরন

বিস্তৃত-উত্তর প্রশ্ন

[এটি প্রশ্ন থাকবে; প্রতিটির উত্তর দিতে হবে]

৪×৩ = ১২

পাঠ ১

বৈচিত্র্যময় বাংলাদেশ

প্রশ্ন-১ বাংলাদেশে বসবাসকারী মানুষের ভাষা বৈচিত্র্যময় কেন? বুঝিয়ে লেখো। (অনুধাবন)

উত্তর: বাংলাদেশে বসবাসকারী সকল মানুষ বাংলাদেশি। এদের মধ্যে যারা বাংলা ভাষায় কথা বলে তারা হলো বাঙালি। বাঙালি ছাড়াও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মানুষ এদেশে বসবাস করে। এদের কেউ চাকমা, কেউ মারমা, কেউ মুরং, কেউ তঞ্চঙ্গ্যা, কেউ-বা সাঁওতাল। সবাই রয়েছে নিজস্ব মাতৃভাষা। সবাই তাদের নিজস্ব মাতৃভাষায় কথা বলতে পছন্দ করে। এ কারণে বাংলা ছাড়াও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মানুষের নিজস্ব ভাষা এ দেশে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তাই বাংলাদেশে বসবাসকারী মানুষের ভাষা বৈচিত্র্যময়।

প্রশ্ন-২ বাংলাদেশে বসবাসকারী বৈচিত্র্যময় জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে আলোচনা করো। (অনুধাবন)

উত্তর: বাংলাদেশে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করে। একই দেশে নানা জাতিগোষ্ঠীর মানুষের বাস বাংলাদেশকে করেছে বৈচিত্র্যময়। এদেশের বাংলাভাষী মানুষেরা বাঙালি নামে পরিচিত। এখানকার পার্বত্য জেলাগুলোতে বাস করে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষ। এদের কেউ চাকমা, কেউ মারমা, কেউ মুরং, কেউ তঞ্চঙ্গ্যা। কেউ আবার অন্য জাতির। পার্বত্য জেলা ছাড়াও দেশের অন্যত্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষ রয়েছে। যেমন: রাজশাহী, দিনাজপুর ও রংপুর জেলার সাঁওতাল ও রাজবংশীদের বসবাস। ময়মনসিংহ অঞ্চলে বসবাস করে গারো সম্প্রদায়ের মানুষ। সিলেটে আছে মুনিপুরি সম্প্রদায়।

প্রশ্ন-৩ বাংলাদেশে রয়েছে বৈচিত্র্যময় ধর্ম ও উৎসব— তুমি কি একমত? আলোচনা করো। (উচ্চতর দক্ষতা)

উত্তর: বাংলাদেশে প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায় হলো মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ আর খ্রিস্টান। তাদের রয়েছে নিজ নিজ ধর্মীয় উৎসব। মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা। হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা, বৌদ্ধদের বুদ্ধপূর্ণিমা ও খ্রিস্টানদের বড়দিন। এগুলোর বাইরেও আরো কিছু উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। যেমন: পহেলা বৈশাখে উদ্‌যাপিত হয় বাংলা নববর্ষ। রাখাইনদের উৎসবের নাম সাংগ্রাই, আর চাকমাদের উৎসব বিজু। একারণে বলা যায়, বাংলাদেশে রয়েছে বৈচিত্র্যময় ধর্ম ও উৎসব।

প্রশ্ন-৪ বাংলাদেশের উৎসবগুলো বৈচিত্র্যময় কেন? (অনুধাবন)

বা, বাংলাদেশে কী কী উৎসব পালন করা হয়? (অনুধাবন)

[পিটিআই সংগ্রহ পরীক্ষণ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ ২০২৬/]

উত্তর: বাংলাদেশে রয়েছে উৎসবের বৈচিত্র্য। এখানকার বিভিন্ন ধর্মের মানুষের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় উৎসব। যেমন: ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা, দুর্গাপূজা, বুদ্ধপূর্ণিমা ও বড়দিন। এছাড়াও বাংলা নতুন বছরকে বরণ করতে বাংলাদেশের মানুষ বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন করে। রাখাইন ও চাকমা সম্প্রদায় যথাক্রমে পালন করে সাংগ্রাই ও বিজু উৎসব। এ দেশের মানুষের ধর্মীয় ও জাতিগত বৈচিত্র্য থাকায় তাদের উৎসবগুলোও বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ।

প্রশ্ন-৫ কোন পেশার মানুষ কী কাজ করে? আলোচনা করো। (অনুধাবন)

উত্তর: মানুষ যে ধরনের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে, সেই কাজকে তার পেশা বলে। বাংলাদেশে অনেক পেশার মানুষ বাস করে। যেমন: কৃষক, জেলে, কামার, কুমার, তাঁতি ইত্যাদি। ফসলের মাঠে কৃষক লাভল বা ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করেন। জেলেরা জাল দিয়ে মাছ ধরেন। কামার আগুন, হাঁপার আর হাতুড়ির সাহায্যে লোহার জিনিস তৈরি করেন। কুমার নরম কাদামাটি নিয়ে চাকায় ঘুরিয়ে মাটির হাঁড়িকুড়ি তৈরি করেন। তাঁতি কাপড় বোনে।

প্রশ্ন-৬ বাংলাদেশ সমৃদ্ধ হওয়ার পিছনে কাদের অবদান রয়েছে?

(উচ্চতর দক্ষতা)

উত্তর: বাংলাদেশে অনেক পেশার মানুষ রয়েছে। কৃষক মাঠে চাষ করেন। জেলেরা জাল দিয়ে মাছ ধরেন। কামার আগুন, হাঁপার আর হাতুড়ির সাহায্যে লোহার জিনিস তৈরি করেন। কুমার নরম কাদামাটি নিয়ে চাকায় ঘুরিয়ে মাটির হাঁড়িকুড়ি তৈরি করেন। তাঁতি কাপড় বোনে। এছাড়া বাংলাদেশের শহর ও গ্রামে আরো নানা পেশার মানুষ দেখা যায়। তারা সবাই পরিশ্রমী। তাদের পরিশ্রমেই বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পেরেছে। তাই বলা যায়, বাংলাদেশ সমৃদ্ধ হওয়ার পিছনে সকল পেশাজীবীদের অবদান রয়েছে।

প্রশ্ন-৭ বাংলাদেশের মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদের পরিচয় দাও। (জ্ঞান)

উত্তর: বাংলাদেশের মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদে রয়েছে বৈচিত্র্য। এ দেশের মানুষ পাঞ্জামা-পাজাবি, শার্ট-প্যান্ট, শাড়ি-রাউজ, সালোয়ার-কামিজ ছাড়াও নানা ধরনের পোশাক পরে থাকে। এদেশের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষের পোশাকে বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। চাকমারা পরিধান করে পিনোন ও হুদি। মারমারা পরে দেয়াহ। সাঁওতালরা পরে পাঞ্চি। গারো সম্প্রদায়ের মানুষ দকমন্দা নামক একধরনের পোশাক পরিধান করে।

প্রশ্ন-৮ বৈচিত্র্য কীভাবে বাংলাদেশকে সুন্দর করেছে? (প্রয়োগ)

[পিটিআই সংগ্রহ পরীক্ষণ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ সদর ২০২৬/]

উত্তর: বাংলাদেশের মানুষের রয়েছে নানা রকম বৈচিত্র্য। এখানে রয়েছে ভাষা, ধর্ম, উৎসব ও পেশার বৈচিত্র্য। বাংলা ভাষা ছাড়াও এদেশে রয়েছে— চাকমা, মারমা, ককবরক, ওরাও, মান্দি, সাঁওতালি ইত্যাদি। এদেশে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রে বাস করে। তারা পালন করে নিজ নিজ ধর্মীয় উৎসব যেমন— ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা, দুর্গাপূজা, বুদ্ধপূর্ণিমা, বড়দিন। এছাড়াও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষ পালন করে বিজু, সাংগ্রাই উৎসব। শুধু তাই নয় পোশাক-পরিচ্ছদেও রয়েছে বৈচিত্র্য। রয়েছে বিভিন্ন রকমের যানবাহন। এদেশে বহু পেশার মানুষ আছে। কেউ কৃষক, কেউ জেলে, কেউ-বা কামার। বাংলাদেশের মানুষের চেহারা আর শারীরিক গঠনেও রয়েছে বৈচিত্র্য। তবে যত রকম বৈচিত্র্যই থাকুক না কেন, সবাই নিজের মতো এ দেশে বসবাস করে এবং সবাই এ দেশকে ভালোবাসে। এসব বৈচিত্র্যই এদেশকে সুন্দর করেছে।

পাঠ ২

তিতুমীর

প্রশ্ন-৯ ইংরেজ ও জমিদাররা কীভাবে বাঙালিদের উপর অন্যায়-অত্যাচার চালাত? (অনুধাবন)

উত্তর: ইংরেজ ও জমিদাররা এ দেশের মানুষ ও চাষীদের শাসনের নামে শোষণ করত। তারা সাধারণ কৃষকদের উপর অন্যায় নির্যাতন ও অত্যাচার করত। তাদের নীলচাষে বাধ্য করত। ইংরেজরা এ দেশের মানুষের টাকায় ধনী হতে চেয়েছিল। তাই তারা এ দেশের মানুষের সম্পদ লুট করতে চেয়েছিল। জমিদাররা এ দেশের চাষীদের থেকে জোরপূর্বক খাজনা আদায় করত। তারা খাজনা দিতে না পারলে চাষীদের চাবুক দিয়ে মারতে চাইত। এভাবে ইংরেজ ও জমিদাররা বাঙালিদের উপর শাসনের নামে অন্যায়-অত্যাচার চালাত।

প্রশ্ন-১০ ইংরেজদের হাত থেকে এ দেশকে মুক্ত করার চিন্তা তিতুমীরের মনে কেন এসেছিল? বুঝিয়ে লেখো। (অনুধাবন) /চিট্রাম সদর ২০২৬/

উত্তর: তিতুমীর ছোটো থেকেই মানুষের জন্য কিছু করতে চাইতেন। সেসময় বাংলাদেশ শাসন করত ইংরেজরা। তারা এ দেশের মানুষের টাকায় ধনী হতে চাইত। অন্যদিকে জমিদাররাও কৃষকদের উপর অত্যাচার চালাত। তাই তিতুমীর নিজ দেশের স্বাধীনতার জন্য কথা বলা শুরু করেন। ইংরেজদের হাত থেকে এ দেশকে মুক্ত করার চিন্তা করেন।

৬২ পাঞ্জেরী প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা। পরীক্ষা ২০২৬

প্রশ্ন-১১ 'তিতুমীরকে নিয়ে পারা যাচ্ছে না। ওকে শাস্তা করতে হবে।'— ব্যাখ্যা করো। (অনুধাবন)

উত্তর: জমিদার ও ইংরেজরা এ দেশের মানুষকে শাসনের নামে শোষণ ও নির্যাতন করত। একদিকে ইংরেজরা বাঙালির সম্পদ লুট করে ধনী হতে চাইত। অন্যদিকে জমিদাররা কৃষকদের খাজনা দিতে বাধ্য করত। এসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিতুমীর প্রতিবাদ করেন। নিজেকে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করেন। তিতুমীরের এমন কর্মকাণ্ডের কারণে জমিদার ও ইংরেজরা চিন্তিত হয়ে পড়েন। এ কারণে তারা তাঁকে দমন করতে চায়, শাস্তা করতে চায়।

প্রশ্ন-১২ নীলচাষীরা কীভাবে অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছিলেন? (অনুধাবন)

উত্তর: ইংরেজ শাসনামলে নীলচাষীদের নীলচাষে বাধ্য করা হতো। তাদের উপর অনায়াস অত্যাচার করা হতো। একসময় তিতুমীরের ডাকে সাজা দিয়ে তারা নিজেদের দেশ ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হন। তারা খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দেন। তারা তিতুমীরের বাঁশের কেলায় যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেন। এরপর ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেন। এভাবে অস্ত্র ধারণ করে নীলচাষীরা তাদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদ করেন।

প্রশ্ন-১৩ ইংরেজরা ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডারকে কেন বাঁশের কেলায় পাঠায়? (অনুধাবন) (চৈনপুর সদর ২০২৬/)

উত্তর: তিতুমীরকে প্রতিহত করতে ইংরেজ সরকার ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডারকে পাঠায়।

তিতুমীর স্বাধীনতার কথা বলেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলেন। তিনি লড়াই করার কথা বলেন। কৃষকদের খাজনা দিতে নিষেধ করেন। তিনি ইংরেজদের দেশ থেকে তাড়াতে চান। এ উদ্দেশ্যে বাঁশের কেলা বানিয়ে তিনি তরুণদের যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করেন। এসব কারণে তিতুমীরকে দমন করতে চায় ইংরেজরা। তাই তারা ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডারকে বাঁশের কেলায় পাঠায়।

প্রশ্ন-১৪ দেশের কল্যাণের জন্য তুমি কী কী করতে চাও, তা লেখো।

(উচ্চতর দক্ষতা) (ময়মনসিংহ সদর ২০২৬/)

উত্তর: দেশের মানুষের কল্যাণ করলেই দেশের কল্যাণ করা হয়। তাই আমি চাই আমার দেশের মানুষকে সহযোগিতা করে দেশের কল্যাণ করতে। আমার থেকে ছোটো বা আমার সমকয়সি গরিব ছেলেমেয়েদের পড়ার বই দেবো। বাবা-মায়ের সহযোগিতা নিয়ে গরিব মানুষদের খাদ্য ও পোশাকের ব্যবস্থা করব। আমার আশেপাশে ঘটে যাওয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলব। এভাবে আমি দেশের কল্যাণ করব।

প্রশ্ন-১৫ তিতুমীর গ্রাম ছেড়েছিলেন কেন? ব্যাখ্যা করো। (অনুধাবন)

উত্তর: ইংরেজ শাসক ও জমিদারদের দীর্ঘদিনের শোষণ ও নির্যাতনে এ দেশের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তাদের থেকে দেশকে মুক্ত করতে চান তিতুমীর। তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে তিনি গ্রাম ছেড়ে নারকেলবাড়িয়ায় যান। সেখানে গিয়ে তিনি কৃষকদের একত্র করে ইংরেজদের বিভাঙিত করার কথা বলেন। কৃষকদের তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি তাদের খাজনা দিতে নিষেধ করেন এবং তরুণদের যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেন।

প্রশ্ন-১৬ ১৮৩১ সালে লর্ড বেটিন্ডক কেন বিশাল সেনাবহর পাঠালেন? বিবরণ দাও। (প্রয়োগ)

উত্তর: তিতুমীর ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে 'বাঁশের কেলা' নামক একটি দুর্গ তৈরি করেন। সেখানে তিতুমীর তরুণদের প্রশিক্ষণ দেন। তাঁদের নিয়ে বেশ কয়েকটি নীলকুঠিও দখল করে ফেলেন তিনি। এ কারণে তাঁকে দমন করতে ১৮৩১ সালে লর্ড বেটিন্ডক বিশাল সেনাবহর পাঠান। ভোরের আলো ফোটার আগেই তারা বাঁশের কেলায় কামান দিয়ে হামলা চালায়। দেশপ্রেমিক তিতুমীর বাহিনী এই যুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করেন। হঠাৎ একটা গুলির আঘাতে তিতুমীর শহিদ হন এবং তাঁর বহু সঙ্গী বন্দি হন।

পাঠ ৩) দূরের পাল্লা

প্রশ্ন-১৭ 'দূরের পাল্লা' কবিতায় ফুটে ওঠা নদীতীরবর্তী প্রাকৃতিক পরিবেশের সৌন্দর্য বর্ণনা করো। (অনুধাবন)

উত্তর: 'দূরের পাল্লা' কবিতায় বাংলাদেশের নদী তীরবর্তী প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জনজীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। সেখানে দেখা যায় তিনজন মাঝি একটি ছিপ জাতীয় নৌকা নিয়ে সারা দিন ব্যাপী ছুটে চলছে। নদীর পাড়ে রয়েছে ঝোপঝাড় ও সবুজ শৈবাল। শৈবালের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে কবি তাকে টাকশালের সাথে তুলনা করেছেন। কবি নদী তীরের ঘর, জেগে ওঠা চরের বর্ণনা দিয়েছেন। এমনকি তার বুনা হাসের শ্যাওলায় ডিম ঢাকার বর্ণনাও ফুটিয়ে তুলেছেন। নদীতে ডুব দেওয়া পানকৌড়ি, গ্রাম্য বধূর গোসল ও কলসী কাখে পানি নেওয়া এবং সেই কলসীতে পানির শব্দ কবির দৃষ্টিগোচর হয়নি।

প্রশ্ন-১৮ 'দূরের পাল্লা' কবিতায় নৌকায় যেতে যেতে মাঝিরা কী কী দেখেছে? (অনুধাবন) (পিত্তিআই সংগ্রহ পরীক্ষণ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ সদর ২০২৬/)

উত্তর: নৌকায় যেতে যেতে মাঝিরা দেখেছে—

- নদীর পাড়ের ঝোপঝাড় ও জঙ্গল।
- নদীর পানিতে জমে থাকা শৈবাল।
- কঞ্চির তৈরি ঘর।
- বন-হাসের ডিম শ্যাওলায় লুকিয়ে রাখা।
- পানকৌড়ি বা পানকৌড়ির পানিতে ডুব দেওয়া।
- ঘোমটা পরা বউয়ের কলসীতে পানি নেওয়া।

প্রশ্ন-১৯ শৈবালকে কেন টাকশাল বলা হয়েছে? (অনুধাবন)

(ময়মনসিংহ সদর, শেরপুর সদর ২০২৬/)

উত্তর: টাকশাল হলো টাকা তৈরির কারখানা। যেখানে অনেক টাকা বা মূল্যবান সম্পদ থাকে। নদীর পানিতে সবুজ রঙের শৈবাল জন্মে। শৈবাল মূলত প্রকৃতির মূল্যবান একটি জলজ উদ্ভিদ যার সঙ্গে কবি টাকশালের তুলনা করেছেন। কারণ শৈবাল প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে যা প্রকৃতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ এই উপমার মাধ্যমে কবি প্রাকৃতিক সম্পদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও প্রাচুর্যকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

পাঠ ৪) পত্র লিখি

প্রশ্ন-২০ আবেদনপত্রে কী কী থাকে? এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করো। (উচ্চতর দক্ষতা)

উত্তর: আবেদনপত্রে কয়েকটি অংশ থাকে। যেমন:

- | | | |
|--------------|---|--|
| তারিখ | — | যেদিন আবেদনপত্র লেখা হয়, সেদিনের তারিখ। |
| বরাবর | — | যাঁর কাছে আবেদন করা হয়, তাঁর পদবি ও ঠিকানা। |
| বিষয় | — | কোন কারণে পত্রটি লেখা হচ্ছে, সেই বিষয়। |
| সম্বোধন | — | 'জনাব' লিখে সম্বোধন। |
| বক্তব্য | — | আবেদনের বক্তব্য বা মূলকথা। |
| অনুরোধ | — | বক্তব্যটি মেনে নেওয়ার অনুরোধ। |
| নিজের পরিচয় | — | পত্রটি যে লিখেছে, তার নাম-পরিচয়। |

পাঠ ৫) ঠিক আছে

প্রশ্ন-২১ 'ঠিক আছে' কবিতায় মেহমান আসায় গৃহকর্তার পরিস্থিতি কী হয়েছে বলে তুমি মনে করো? আলোচনা করো। (উচ্চতর দক্ষতা)

উত্তর: 'ঠিক আছে' কবিতায় মেহমান আসলে গৃহকর্তা বিভ্রম্ভনায় পড়ে যান। কবিতার গৃহকর্তা দারিদ্র্যে নিমজ্জিত ছিলেন। তার অভাবপূর্ণ সংসারে ঝামেলার অন্ত নেই। তার ঘরে রান্না হয় রেশনের পচা বাসি ডাল। থালা-বাটির অবস্থাও ছিল খুব কবুণ। এমনকি বৃষ্টির সময় দেওয়ার মতো ভালো একটি ছাতাও তার নেই। অর্থাৎ অতিথ্যেতা করার সক্ষমতা তার ছিল না। তাই অসময়ে বাড়িতে মেহমান আসায় গৃহকর্তা অপ্রস্তুত হয়ে যান।



প্রশ্ন-২২ গৃহকর্তা কেন মেহমানকে সংসারের ঝামেলার দিকগুলো বুঝিয়েছেন? ব্যাখ্যা করো। (অনুধাবন)

উত্তর: লোকটির বাড়িতে একজন মেহমান অসময়ে চলে আসেন। গৃহকর্তা সংসারে তখন নানা ঝামেলা ছিল। তার বাড়িতে খাবার, থালা-বাটি, ছাতা কোনো কিছুই ঠিকঠাক অবস্থায় নেই। মেহমানের সামনে সেসব ঝামেলার দিকগুলো তুলে তিনি মূলত দুঃখ ও লজ্জা প্রকাশ করেছেন। যদিও তার মেহমান এসব বিষয়ে কিছুই মনে করেনি বরং ঠিক আছে বলে সবকিছু মেনে নিয়েছেন।

প্রশ্ন-২৩ 'তবু তিনি বললেন, ঠিক আছে ঠিক আছে।'— ব্যাখ্যা করো। (প্রয়োগ)

উত্তর: 'ঠিক আছে' কবিতায় গৃহকর্তার অভাব অনটনের সময়ে একজন মেহমান বাড়িতে আসেন। গৃহকর্তার সংসারে তখন নানা ঝামেলা ছিল। সংসারের ঝামেলার কথা জানালে মেহমান সবকিছু মেনে নেন। এমনকি রেশনের পচা চাল, টলটলে বাসি ডাল, ভাঙা-চোরা থালা, লিক হওয়া বাটি ইত্যাদি দেখেও মেহমান কিছু মনে করেন না। অর্থাৎ অভাব-অনটনের কারণে আতিথেয়তায় কমতি হলেও সহনশীল মেহমান তা হাসিমুখেই মেনে নেন।

প্রশ্ন-২৪ 'ঠিক আছে' কবিতায় যেকোনো পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেওয়ার বিষয়টি কীভাবে ফুটে উঠেছে? (উচ্চতর দক্ষতা)

বা, 'ঠিক আছে' কবিতার মেহমান চরিত্রের সহনশীল মনোভাবের পরিচয় তুলে ধরো। (উচ্চতর দক্ষতা)

উত্তর: বাড়িতে হঠাৎ মেহমান চলে আসেন। তখন সংসারের নানা ঝামেলার কথা মেহমানকে জানান সংসারের কর্তা লোকটি। এসব কথা শুনে মেহমানটি হাসিমুখে ঠিক আছে বলে খেতে বসেন। রেশনের পচা চাল, টলটলে বাসি ডাল, ভাঙা-চোরা থালা ও লিকওয়ালা বাটিতে খেতে দেন। তারপর মেশ হয়ে এলে মেহমান ছাতা চান। কিন্তু লোকটি তার ছাতা বের করে দেখান গুটাতে শুধু কয়েকটি শিক আছে। এতগুলো খারাপ পরিস্থিতির মাঝেও মেহমান সব হাসিমুখে মেনে নেন এবং সবকিছু ঠিক আছে বলে জানান।

পাঠ ৬) সুখ আর দুখ

প্রশ্ন-২৫ 'দুখ, কেঁদো না। আমার সাথে এসো।'— কথাটি কে, কেন বলেছে? ব্যাখ্যা করো। (অনুধাবন)

উত্তর: তাঁতির ছোটো মেয়ের নাম দুখ। সে বাবার জন্য সুতা কেটে দেয়। একদিন দুখ উঠানে তুলা রোদে দিয়ে বসেছিল। এমন সময় দমকা বাতাস এসে তার তুলাগুলো উড়িয়ে নিয়ে যায়। তুলাগুলো হারিয়ে দুখ মনের দুঃখে কাঁদছিল। তখন বাতাস দুখকে তুলা দেবে বলে কারা করতে বারণ করে। এবং তার সাথে যাওয়ার জন্য আহ্বান করে। অর্থাৎ দুখর কষ্ট দেখে বাতাস দুখকে প্রসন্নতা কথাটি বলে।

প্রশ্ন-২৬ কলাগাছকে দুখ কেন ও কীভাবে সাহায্য করে? আলোচনা করো। (অনুধাবন)

উত্তর: বাতাস যখন দুখর তুলা উড়িয়ে নিয়ে যায় তখন দুখ বাতাসের পিছু পিছু যায় তুলা ফেরত আনার জন্য। হঠাৎ পথের মধ্যে একটি কলাগাছের সাথে দেখা হয় দুখর। কলাগাছটি লতাপাতায় জড়িয়ে ছিল। সেইগুলো সরানোর জন্য দুখকে অনুরোধ করে কলাগাছটি। তাই দুখ সব লতাপাতা সরিয়ে কলাগাছকে মুক্ত করে দেয়। এভাবে দুখ কলাগাছকে সাহায্য করে।

প্রশ্ন-২৭ বাতাসের সঙ্গে যেতে যেতে দুখ কাদের ও কীভাবে উপকার করল? বর্ণনা করো। (অনুধাবন) / চরিত্রায়ন ২০২৬/

উত্তর: বাতাসের সঙ্গে যেতে যেতে দুখ কলাগাছ ও ঘোড়ার উপকার করে। সে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় কলাগাছ তার কাছে সাহায্য চায়। তখন সে তার পায়ে থাকা লতাপাতা সরিয়ে দেয়। কলাগাছকে সাহায্য করার পর একটি ঘোড়া দুখর কাছে সাহায্য চায়। তখন দুখ ঘোড়াকে কচি ঘাস কেটে খেতে দেয়। এভাবেই দুখ কলাগাছ ও ঘোড়ার উপকার করল।

প্রশ্ন-২৮ বুড়ির বাড়িতে দুখর সাথে কী হয়েছিল? বিস্তারিত লেখো। (প্রয়োগ)

উত্তর: বাতাসের পিছু নিয়ে দুখ সুতা কাটা বুড়ির বাড়ি পৌঁছে যায়। তারপর দুখ বুড়ির কাছে তার তুলা হারানোর কথা বলে। বুড়ির বাড়িতে পৌঁছালে বুড়ি দুখকে গোসল করে কিছু খাবার খেতে বলে। এরপর বুড়ি কাপড় নেওয়ার ঘর দেখিয়ে দেয় দুখকে। বুড়ির দেখানো ঘরে যেয়ে দুখ দেখে সেখানে অনেক দামি গামছা আর কাপড়। কিন্তু সে লোভ না করে সাধারণ একটা গামছা ও কাপড় নেয়। তারপর সেগুলো নিয়ে পুকুরে ডুব দিতে যায়। একটা ডুব দেওয়ার পরই দুখর পা সোনার গয়নায় ভরে যায়।

প্রশ্ন-২৯ দুখর গুণগুলো আলোচনা করো। (উচ্চতর দক্ষতা)

উত্তর: দুখ ছোটো থেকেই অনেক পরিশ্রমী। সে সবসময় সবাইকে সাহায্য করে। বাবার জন্য সুতা কাটে, কলাগাছের লতাপাতা সরিয়ে দেয়, ঘোড়াকে কচি ঘাস কেটে দেয়। দুখর ব্যবহারও অনেক মিষ্টি। সে দামি কাপড় আর খাবার দেখেও লোভ করে না। সাধারণ কাপড় নেয় এবং সাধারণ খাবার খায়। বুড়ি তাকে ইচ্ছামতো তুলা নিতে বললেও সে কেবল তার যতটুকু তুলা বাতাস উড়িয়ে নিয়েছিল ততটুকু নেয়।

প্রশ্ন-৩০ দুখ কেন ভালো সবকিছু পেল? ব্যাখ্যা করো। (অনুধাবন)

উত্তর: দুখ ছিল বিনয়ী ও পরোপকারী। সে পরিবারের সব কাজ করে এবং তার বাবাকে সুতা কেটে দিয়ে সাহায্য করে। একদিন বাতাস তার তুলা উড়িয়ে নিয়ে গেলে সে বাতাসের সাথে সাথে যেতে থাকে। পথিমধ্যে রাস্তায় কলাগাছের লতাপাতা সরিয়ে সে কলাগাছের উপকার করে। এভাবে সে এক ছড়া সোনার কলা উপহার পায়। ঘোড়াকে কচি ঘাস কেটে দেওয়ার ঘোড়া তাকে পজিরাজ ঘোড়ার বাচ্চা উপহার দেয়। বুড়ির কাছে লোভ না করায় পা ভরতি সোনার গয়না ও হারানো তুলা ফেরত পায়। দুখর সততা ও অন্যকে সহযোগিতা করার মানসিকতার জন্যই সে ভালো ভালো উপহার পায়।

প্রশ্ন-৩১ সুখ চরকা কাটতে বসে কেন? ব্যাখ্যা করো। (অনুধাবন)

উত্তর: সুখ ছিল লোভী ও অকৃতজ্ঞ। সে বাড়ির কোনো কাজ করে না। সবার সাথে খারাপ ব্যবহার করে। কিন্তু দুখর কথা শুনে তার মনে লোভ হয়। তার কথা অনুযায়ী তখন সে তুলা নিয়ে চরকা কাটতে উঠানে বসে। মূলত দুখর পা ভরতি গয়না ও উপহার দেখে সুখর মনে লোভ হয়েছিল। তাই সুখ মনে মনে ভাবে বুড়ির কাছে যাবে। এজন্য পরের দিন সুখ চরকা কাটতে বসেছিল।

প্রশ্ন-৩২ বুড়ির কাছে গিয়ে সুখ কী কী করে? বিবরণ দাও। (প্রয়োগ)

উত্তর: বাতাসের সাথে সাথে সুখ বুড়ির কাছে যায়। বুড়িকে তার কাজ বাদ দিয়ে আগে তার জিনিস দিতে বলে। বুড়ি তাকে কাপড় নিয়ে পুকুরে ডুব দিতে বললে সুখ সবচেয়ে দামি গামছা আর কাপড় বেছে নেয়। বেশি বেশি গয়না পাওয়ার আশায় পুকুরে ইচ্ছামতো ডুব দেয় সে। খাবার ঘরে গিয়ে ভালো ভালো খাবার খায়। তুলা নেওয়ার সময়ও সে ইচ্ছামতো প্যাটরা ভরে তুলা নেয়।

প্রশ্ন-৩৩ সুখর পরিণতি কী হয়? বর্ণনা করো। (প্রয়োগ)

উত্তর: দুখর মতো উপহার পাওয়ার লোভে সুখ তুলা কাটতে বসে। বাতাস তার তুলা উড়িয়ে নিয়ে গেলে সেও বাতাসের সাথে সাথে যায়। এরপর সে বুড়ির কাছে গিয়ে তার সাথে খারাপ ব্যবহার করে। সেখানে সব থেকে দামি গামছা ও কাপড় নিয়ে গোসল করতে যায়। বেশি সোনা পাওয়ার লোভে পানিতে বেশি ডুব দিতেই তার শরীর চুলকাতে শুরু করে। আর সে কোনো সোলাই পেল না। তার গলার স্বর বিকৃত হয়ে যায়। এরপর খাবার ঘরে গিয়ে গপ গপ করে ভালো খাবার খায় ইচ্ছামতো প্যাটরা ভরে তুলা নিলো। তুলা নিয়ে ফেরার সময় ঘোড়া তাকে একটা লাখি দেয়। লাখি খেয়ে সুখ ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে হাঁটে। তারপর রাস্তায় কলাগাছ একটা বড়ো পাতা ভেঙে ফেলে সুখর মাথায়। এরপর বাড়িতে এলে সুখ দেখে তার প্যাটরায় তুলাও নেই। এভাবেই নির্মম পরিণতির শিকার হয় দুখ।

৬৪ পাঞ্জেরী প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা। পরীক্ষা ২০২৬

[প্রশ্ন-৩৪] সুখ ও দুখ চরিত্রের তুলনা করো। (প্রয়োগ)
উত্তর: সুখ ও দুখ চরিত্রের তুলনা নিচে দেওয়া হলো—

সুখ	দুখ
১. সুখ অলস ও লোভী।	১. দুখ পরিশ্রমী ও সং।
২. সুখ কখনো কাউকে সাহায্য করে না।	২. দুখ সবসময় অপরকে সাহায্য করে।
৩. সুখ বুড়ির ঘরের দামি কাপড় ও খাবার দেখে লোভ করে।	৩. দুখ বুড়ির ঘরের দামি কাপড় ও খাবার দেখে লোভ করে না।
৪. সুখ অন্যের সাথে খারাপ ব্যবহার করে।	৪. দুখ সবার সাথে ভালো ব্যবহার করে।
৫. সুখ লোভের কারণে শান্তি পায়।	৫. দুখ নির্লোভের কারণে পুরস্কার লাভ করে।

পাঠ ৭ সাইক্রোন

[প্রশ্ন-৩৫] 'সাইক্রোন' কবিতা অনুসারে ঘূর্ণিঝড়ের ভয়াবহতা নিবুপন করো। (প্রয়োগ) *(চৈনিক নদর ২০২৬)*

উত্তর: সাইক্রোন বা ঘূর্ণিঝড় একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এর ভয়াল দিকটি 'সাইক্রোন' কবিতায় ফুটে উঠেছে। সাইক্রোনের প্রভাবে বাতাস ও পানির বেগ তীব্র আকার ধারণ করে। বাতাসের তোড়ে চাল, ডাল, গরু, মহিষ প্রকৃতি উড়ে যায়। এ সময় আশেপাশের সবকিছু উড়িয়ে নিয়ে বাতাসে চরকির মতো ঘুরে। ঘূর্ণিঝড়ে পানি প্রবল বেগে লোকালয়ে ধেয়ে আসে এবং সবকিছু তাসিয়ে নিয়ে যায়। পানিতে ডুবে যায় বিস্তীর্ণ এলাকা, পশুপাখি, মানুষ। প্রকৃতির এই ধ্বংসাত্মক শক্তির কাছে মানুষ অসহায়। তারা কেবল আশ্রয় খোজে সৃষ্টিকর্তার কাছে।

[প্রশ্ন-৩৬] 'সাইক্রোন' কবিতায় হারান মাখি ও পরান শেখের ডাকাডাকিতে কী প্রকাশ পায়? (অনুধাবন)

উত্তর: 'সাইক্রোন' কবিতায় হারান মাখি এবং পরান শেখের ডাকাডাকিতে বিপদের সময় মানুষের বাঁচার আবুলতা প্রকাশ পেয়েছে। ঘূর্ণি হওয়া মাছ ও গাছ উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া পানির তোড়ে খাল ফুলে উঠছে এবং বাতাসের প্রবল বেগ নৌকার পাল ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও হারান মাখি এবং পরান শেখ দুই ধর্মের মানুষ তাদের একসঙ্গে বাতাস ফুঁড়ে ডাক দেওয়া প্রমাণ করে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কাছে সকল মানুষ সমান, না প্রাকৃতিক দুর্যোগের সামনে মানুষের অসহায়ত্বকে ফুটিয়ে তোলে।

[প্রশ্ন-৩৭] 'সাইক্রোন' কবিতায় বর্ণিত সীমাহীন দুর্ভোগের বিষয়টি আলোচনা করো। (প্রয়োগ)

উত্তর: 'সাইক্রোন' কবিতায় প্রাণিকুলের সীমাহীন দুর্ভোগ ও শোচনীয় পরিস্থিতি প্রকাশ পেয়েছে। সাইক্রোনের কারণে মানুষ, পশুপাখি সব অসহায় হয়ে পড়ে। এ সময় নৌকার পাল ছিঁড়ে যায়, পানির প্রবল তোড়ে সবকিছু ভেসে যায়। হারান মাখি, পরান শেখ আতঙ্কিত হয়ে ডাকাডাকি করে। ঝড়ের তীব্রতা বৃষ্টি করে গুঁড়োর মতো আঘাত হানে। লোকালয় পানিতে ডুবে যায়। শেয়াল, কুকুর, শালিক সব পানিতে ডুবে যায়। চম্পাবতী নামের কিশোরী পানিতে ডুবে যায়, ভেসে থাকে তার চুল। এই তাণ্ডবের মাঝে অসহায় মানুষ জাতি সৃষ্টিকর্তার নিকট আশ্রয় খোজে। সীমাহীন এই দুর্ভোগের কাছে মানুষ চরম অসহায়।

পাঠ ৮ রয়েল বেঙ্গল টাইগার

[প্রশ্ন-৩৮] রয়েল বেঙ্গল টাইগারের পরিচয় দাও। (অনুধাবন)

উত্তর: রয়েল বেঙ্গল টাইগার বাংলাদেশের জাতীয় পশু। এ দেশের মানুষের কাছে এটি বাঘ নামে পরিচিত। এই বাঘ দেখতে যেমন সুন্দর, তেমন ভয়ংকর এর আচরণ। এদের দৃষ্টি, শ্রবণ ও স্নাণশক্তি অত্যন্ত প্রখর, যা তাদের বনের দক্ষ শিকারি হিসেবে গড়ে তুলেছে। বাঘের খাবার নিচের অংশ নরম ও পুরু হওয়ায় এরা নিঃশব্দে চলাফেরা করতে পারে। এরা খুব ভালো সাঁতারও কাটতে পারে। বাংলাদেশের সুন্দরবনে এই বাঘ দেখা যায়। পৃথিবীতে অনেক প্রজাতির বাঘ থাকলেও রয়েল বেঙ্গল টাইগার সবচেয়ে রাজসিক।

[প্রশ্ন-৩৯] রয়েল বেঙ্গল টাইগারের শারীরিক গঠন বর্ণনা করো। (প্রয়োগ)
উত্তর: রয়েল বেঙ্গল টাইগার বিভাল প্রজাতির সবচেয়ে বড়ো প্রাণী। এর গায়ের রং হলুদ থেকে গাঢ় কমলা হয়ে থাকে। এর গায়ে কালো রঙের ডোরাকাটা দাগ থাকে এবং পেটের দিকটা সাদা থাকে। একটি বাঘের দৈর্ঘ্য ২২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। কাঁধের দিকে বাঘের উচ্চতা ১০০ সেন্টিমিটারের মতো এবং লেজ ৬০ থেকে ১১০ সেন্টিমিটার লম্বা হয়ে থাকে। পুরুষ বাঘের গড় ওজন ২২০ কেজি, আর বাঘিনীর গড় ওজন ১৪০ কেজি। এদের খাবা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং খাবার নিচের অংশ নরম ও পুরু। তাই এরা নিঃশব্দে শিকার ধরতে পারে।

[প্রশ্ন-৪০] কোন কোন বৈশিষ্ট্য বাঘকে দক্ষ শিকারি বানিয়েছে? (প্রয়োগ)
(পেরপুর, নদর ২০২৬)

উত্তর: অসাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য বাঘকে দক্ষ শিকারি বানিয়েছে। বাঘের দৃষ্টি, শ্রবণ ও স্নাণশক্তি খুবই প্রখর। তাছাড়া বাঘের আছে শক্তিশালী খাবা। খাবার নিচের অংশ নরম ও পুরু। তাই বাঘ নিঃশব্দে চলতে পারে, যা তাকে শিকার ধরতে বাড়তি সুবিধা দেয়। শিকার ধরার সময় খাবা থেকে নখর বেরিয়ে আসে। এসব বৈশিষ্ট্য বাঘকে দক্ষ শিকারি বানিয়েছে।

[প্রশ্ন-৪১] রয়েল বেঙ্গল টাইগার চিরতরে হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে হবে কেন? (উচ্চতর দক্ষতা)

উত্তর: রয়েল বেঙ্গল টাইগার বাংলাদেশের জাতীয় পশু। এটি আমাদের এক অমূল্য সম্পদ। তাই একে রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। এই বাঘ সুন্দরবনের পরিবেশ রক্ষা করে একে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচায়। বাঘের ভয়ে মানুষ সুন্দরবনে ঢুকে গাছ কাটার সাহস পায় না। ফলে আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষিত থাকে। যদি বাঘ চিরতরে হারিয়ে যায় তাহলে সুন্দরবনের ভারসাম্য নষ্ট হবে। এছাড়াও পৃথিবীতে বাংলাদেশের পরিচিতি ও গৌরব বাড়িয়েছে এই বাঘ। অসাধু শিকারীদের হাত থেকে বাঘকে রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। তাই পরিবেশের ভারসাম্য এবং দেশের গৌরব টিকিয়ে রাখতেই রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে রক্ষা করা প্রয়োজন।

[প্রশ্ন-৪২] রয়েল বেঙ্গল টাইগার চিরতরে হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে হলে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে? আলোচনা করো। (উচ্চতর দক্ষতা)

উত্তর: বাংলাদেশের জাতীয় পশু রয়েল বেঙ্গল টাইগার। এই বাঘ সুন্দরবনে বাস করে। তাই একে রক্ষা করতে হলে প্রথমত, সুন্দরবনকে রক্ষা করতে হবে। সুন্দরবনের গাছ কাটা থেকে মানুষকে প্রতিহত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, কিছু লোক চামড়া ও অন্যান্য প্রত্যাজের লোভে বাঘ মেরে ফেলে। সঠিক আইন প্রয়োগ করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। মূলত রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে চিরতরে হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে হলে তার অভয়ারণ্য সুন্দরবনকে নিরাপদ রাখতে হবে। তাহলেই একে চিরতরে হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করা যাবে।

পাঠ ৯ টুকটুক ও চিকু

[প্রশ্ন-৪৩] টুকটুক বিভালছানাটিকে কোথা থেকে এবং কী অবস্থায় উদ্ধার করল? বর্ণনা করো। (অনুধাবন)

উত্তর: বাড়ির কাছাকাছি এসে হঠাৎ টুকটুক মিউ মিউ শব্দ শুনতে পেল। কৌতূহলী হয়ে সে এদিক-ওদিক তাকালো। শব্দ শুনে এগিয়ে গিয়ে বাগানের কোণে একটা বিভালছানা দেখতে পেল। ছানাটি ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে কাঁপছে। কাদামাটি মাখা কজ্জালসার শরীর নিয়ে মিউ মিউ করে ডাকছে এবং তার একটা পা কেটে গেছে। সে বাগানের কোণে এ রকম আহত ও অসহায় অবস্থায় বিভালছানাটিকে দেখতে পেল।

[প্রশ্ন-৪৪] টুকটুকের মন বিভালছানাটির জন্য কেনে উঠল কেন? (অনুধাবন)

উত্তর: টুকটুক দেখল বিভালছানাটি ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে কাঁপছে। কাদামাটি মাখা কজ্জালসার শরীর নিয়ে মিউ মিউ করে ডাকছে। মনে হচ্ছে তার একটা পা কেটে গেছে। উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে টুকটুক চারদিকে তাকালো। কাউকে দেখতে পেল না। টুকটুক একাই বিভালছানাটির দিকে এগিয়ে গেল এবং জিজ্ঞেস করল বিভালছানাটি ভয় পেয়েছে কি না? অবলা প্রাণী কথা বলতে পারে না। কিন্তু তার চোখ দেখে মনে হলো তাতে পানি জমেছে। বিভালের চোখের সেই পানি দেখে টুকটুকের মন বিভালছানাটির জন্য কেনে উঠল।

[প্রশ্ন-৪৫ টুকটুক কীভাবে বিড়ালছানাটির যত্ন নিল? (অনুধাবন)]

উত্তর: টুকটুক বাগানের কোণ থেকে আহত একটি বিড়ালছানাকে কোলে করে নিয়ে আসে। আতঙ্কিত ছানাটি কান্দছিল, টুকটুক মায়ের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ছানাটির যত্ন নেয়। সে প্রথমে নরম তোলোলে দিয়ে বিড়ালছানাটির গা মুছিয়ে দিলো। পায়ের কাটা জায়গাটা পরিষ্কার করে শুষ্ক লাগিয়ে দিলো। টুকটুকের মা একটি ছোটো পাত্রে দুধ দিলেন। বিড়ালছানাটি ধীরে ধীরে দুধ খেল। একটু পর টুকটুকের কোলে বিড়ালছানাটি ঘুমিয়ে পড়ল।

[প্রশ্ন-৪৬ 'কেউ তোমাদের এভাবে তাড়া করলে কেমন লাগত?—' কথাটি কে এবং কাকে বলেছিল? ব্যাখ্যা করো। (উচ্চতর দক্ষতা)]

উত্তর: প্রমোক্ত কথাটি টুকটুক রাস্তায় থাকা কয়েকটা ছেলেকে বলেছিল। একদিন টুকটুক বাইরে খেলছিল। তখন দেখল কয়েকটা ছেলে রাস্তায় একটা বিড়ালছানাকে তাড়া করছে। সে দৌড়ে গিয়ে তাদের থামায়। সে ছোট বিড়ালছানাটিকে মারার কারণ জানতে চায়। তখন একটি ছেলে জানায় যে, তারা শুধু মজা করছে। টুকটুক রাগ করে তখন জানতে চায়, যদি কেউ তাদের তাড়া করত তাহলে তাদের কেমন লাগত। অর্থাৎ বিড়ালছানাকে তাড়া করার কারণে টুকটুক রাগ করে কথাটি বলে।

[প্রশ্ন-৪৭ অন্য পশুপাখির যত্নে টুকটুক কী কী করত? (অনুধাবন)]

উত্তর: চিকুর পাশাপাশি অন্যান্য পশুপাখির প্রতিও টুকটুকের মায়ী ছিল। একদিন রাস্তায় কয়েকটা ছেলে একটা বিড়ালছানাকে তাড়া করছিল। টুকটুক দৌড়ে গিয়ে তাদের থামায়। বিড়ালছানাটিকে উদ্ধার করে সে মাঠের নিরাপদ জায়গায় নিয়ে আসে। এরপর থেকে টুকটুক আশপাশের অন্য পশুপাখির প্রতিও বেশ যত্নবান হয়ে ওঠে। পাখিদের জন্য টুকটুক প্রতিদিন জানালার ধারে এক মুঠো ভাত রেখে দিত। গ্রীষ্মের দাবদাহে বাটি ভরে পানি রেখে দিত যাতে পাখিরা পানি খেতে পারে।

[প্রশ্ন-৪৮ 'প্রাণীদের বন্ধু' ক্লাবটি কীভাবে গঠিত হয়েছিল? (অনুধাবন)]

উত্তর: টুকটুক পশুপাখিদের প্রতি যত্নশীল। সে একটি আহত বিড়ালছানাকে উদ্ধার করে নিজের কাছে রাখে। কয়েকটি ছেলের তাড়া থেকে আরেকটি বিড়ালছানাকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায়। এরপর পাখিদের জন্য সে জানালার ধারে ভাত ও পানি রাখে। এভাবে টুকটুক তার আশপাশের পশুপাখিদের প্রতি যত্নবান হয়ে সহপাঠীদের নিয়ে 'প্রাণীদের বন্ধু' ক্লাবটি গঠন করেছিল। ক্লাব গঠনে টুকটুকের শ্রেণি শিক্ষক তাদের সহায়তা করেছিলেন।

[প্রশ্ন-৪৯ 'বন্ধুর বিপদে পাশে দাঁড়ানোই তো সত্যিকারের ভালোবাসা।'— 'টুকটুক ও চিকু' গল্পের আলোকে ব্যাখ্যা করো। (প্রয়োগ)]

উত্তর: 'টুকটুক ও চিকু' গল্পে টুকটুক বাগানের কোণ থেকে একটি আহত বিড়ালছানাকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে যায়। বিড়ালছানাটিকে সে যত্নের সাথে সেবা-শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তোলে ও তার নাম দেয় চিকু। ধীরে ধীরে চিকু টুকটুকের বন্ধু হয়ে যায়। চিকুকে ভালোবেসে অন্যান্য প্রাণীর প্রতিও সে যত্নশীল হয়ে ওঠে। একদল ছেলের আক্রমণ থেকে সে একটি বিড়ালছানাকে রক্ষা করে। এরপর পাখিদের জন্য সে ভাত-পানি রেখে দেয়। সহপাঠীদের সাথে নিয়ে 'প্রাণীদের বন্ধু' নাম ক্লাব গড়ে তোলে। এভাবে টুকটুক প্রাণীদের বন্ধু হয়ে ওঠে। আর তাদের বিপদে সে এগিয়ে আসে। মূলত প্রশ্নের কথাটি দিয়ে প্রাণীদের প্রতি টুকটুকের বন্ধুপ্রতিম মনোভাবকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

[প্রশ্ন-৫০ টুকটুকের মতো তুমি কীভাবে পশুপাখির যত্ন নিবে? বর্ণনা করো। (প্রয়োগ)]

উত্তর: গল্পের টুকটুকের মতো আমিও বিপদে পড়া পশুপাখির যত্ন নেব। আহত বা বিপন্ন কোনো প্রাণী দেখলে উদ্ধার করে নিরাপদ আশ্রয় দেবো। টুকটুকের মতো আমিও পশুপাখির সেবা-শুশ্রূষা করব। প্রয়োজনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করব। টুকটুকের মতো আমিও আমার আশপাশের পশুপাখির জন্য খাবার ও পানির ব্যবস্থা করব। অর্থাৎ নিয়মিত খাদ্য, পানীয়, সেবা ও মমতা দিয়ে পশুপাখির যত্ন নেব।

৫ম শ্রেণি বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা ০৩ক

পাঠ ১০) রাখাল ছেলে

[প্রশ্ন-৫১ 'রাখাল ছেলে' কবিতায় বর্ণিত গ্রামীণ প্রকৃতির রূপের বিবরণ দাও। (অনুধাবন)]

উত্তর: 'রাখাল ছেলে' কবিতায় বাংলার পল্লি-প্রকৃতির এক চমৎকার রূপ ফুটে উঠেছে। এখানে দেখা যায়, নীল আকাশের নিচে সবুজ গ্রাম। এই গ্রামে কলার পাতা পাখার মতো দোলে। শিশিরে ভেজা ঘাসগুলো ভোরের রোদে ঝিকমিক করে ওঠে। পূর্ব আকাশে রঙিন মেঘের নৌকা ভেসে বেড়ায়। মাঠে সরষে ফুল এবং মটরশুটি গাছ দেখা যায়। সকালের মিষ্টি হাওয়া এবং সারা মাঠের প্রকৃতি রাখালকে বন্ধু হিসেবে পেতে চায়। এই কবিতায় গ্রামবাংলার সহজসরল রূপটিই ফুটে উঠেছে।

[প্রশ্ন-৫২ 'রাখাল ছেলে' কবিতায় ফুটে ওঠা মাতৃভক্তির পরিচয় তুলে ধরো। (উচ্চতর দক্ষতা)]

উত্তর: 'রাখাল ছেলে' কবিতায় মায়ের জন্য রাখাল ছেলের গভীর মমতা ও টান লক্ষ্য করা যায়। কেউ একজন রাখাল ছেলেকে কোথায় যাচ্ছে জিজ্ঞাসা করে। তখন রাখাল বলে, সে নিজের গ্রামে মায়ের কাছে যাচ্ছে। সে জানে তার মা ছোট্ট কুটিরে একলা বসে তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। মায়ের জন্য সে দ্রুত বাড়ি ফিরতে চায়। তাই সে লোকটিকে অনুরোধ করে যেন তাকে এখন আটকে না রাখা হয়। মায়ের কাছে পৌঁছানোর জন্য তার মনে একধরনের ব্যাকুলতা কাজ করে, যা মায়ের প্রতি রাখাল ছেলের গভীর ভালোবাসাকেই প্রকাশ করে।

[প্রশ্ন-৫৩ রাখাল ছেলের গ্রামের বিবরণ দাও। (উচ্চতর দক্ষতা)]

উত্তর: 'রাখাল ছেলে' কবিতায় নীল নোয়ানো সবুজ ঘেরা গ্রামে রাখাল ছেলের বাস। সেখানে কলা গাছের পাতা পাখার মতো দোলে, শিশির পা ধুয়ে দেয়। সেই গ্রামে আছে সোনালি পাতার ছাউনি দেওয়া এক ছোট্ট কুটির। ঘরটি সন্ধ্যার সময় আঁবির রঙে পূর্ণ হয়ে ওঠে। এই ছোট্ট কুটিরেই রাখাল ছেলের মা তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। এই গ্রামের প্রতি রাখাল ছেলে প্রবল আকর্ষণের মূল কারণ তার মা। মূলত এই গ্রামটি রাখাল ছেলের মাতৃতুল্য।

[প্রশ্ন-৫৪ 'সারা রাতের স্বপন আমার মিঠেল রোদে হাসে।'— বলতে কী বোঝানো হয়েছে? (প্রয়োগ)]

উত্তর: এখানে ভোরের কোমল রোদের সাথে রাখাল ছেলের রাতের স্বপ্নকে মেলানো হয়েছে। রাখাল ছেলে রাতে অনেক সুখের স্বপ্ন দেখে। সকালের শিশির-ভেজা ঘাসে তার স্বপ্নগুলো যেন বাস্তবে ধরা দেয়। শিশির-ভেজা ঘাসের উপর ভোরের সোনালি রোদ পড়লে তা ঝিকমিক করে ওঠে। তা দেখে রাখাল ছেলের মনে হয় তার রাতের স্বপ্নগুলোই হাসছে। মাঠের সবুজ প্রকৃতি তার কাছে স্বপ্নের মতোই সুন্দর লাগে। মূলত প্রকৃতির সৌন্দর্য ও রাখালের মনের আনন্দকে এক সুতায় গাঁথতেই এই উক্তিটি করা হয়েছে।

[প্রশ্ন-৫৫ রাখাল ছেলের সাথে প্রকৃতির বন্ধুত্বের পরিচয় দাও। (প্রয়োগ)]

উত্তর: 'রাখাল ছেলে' কবিতায় রাখাল ছেলের সাথে প্রকৃতির গভীর মিতালি লক্ষ্য করা যায়। সকালের হাওয়া তাকে খেলা করার জন্য ডাকে। সরষে ফুল পাপড়ি নেড়ে তাকে কাছে ডাকে। মটরশুটি গাছ তার পায়ে জড়িয়ে ধরে খেলতে অনুরোধ করে। শিশির-ঝরা ঘাস আর মিষ্টি রোদে সে তার স্বপ্নকে বাস্তবে দেখে। আকাশে ভেসে চলা রঙিন মেঘের নাও তাকে মুগ্ধ করে। পুরো মাঠ তাকে বন্ধু হিসেবে খেলতে ডাকে। রাখাল ছেলেও এই ডাক শুনতে পায়। প্রকৃতির সাথে রাখাল ছেলের এক সহজ ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

[প্রশ্ন-৫৬ 'সাঁঝের বেলা কইব কথা এখন তবে যাই'— পঙ্কজিতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। (উচ্চতর দক্ষতা)]

উত্তর: এই উক্তিটির মাধ্যমে রাখাল ছেলের প্রকৃতির প্রতি টান ফুটে উঠেছে। সকালবেলা চারপাশের প্রকৃতি তাকে খেলার জন্য হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সকালের বাতাস, সরষে ফুল আর মটরশুটি সবাই তার অপেক্ষায় থাকে। তাই সকালে কেউ যখন তাকে গল্প করার জন্য থামায়, তখন সে খেলতে যাওয়ার কথা বলে। সে জানায়, সারা মাঠ থেকে খেলার ডাক এসেছে। এখন তার গল্প করার সময় নেই। সারাদিন খেলা শেষে সন্ধ্যার সময় সে কথা বলবে। এখন তার শুধু প্রকৃতির সাথে খেলা করার সময়।

পাঠ ১১ কুটির শিল্প

[প্রশ্ন-৫৭ কুটির পণ্য কোন কাজে লাগে? (অনুধাবন)]

উত্তর: দৈনন্দিন নানা প্রয়োজনে কুটির পণ্য কাজে লাগে। মাটির তৈরি থালা-বাটি, হাড়ি-পাতিল, তাঁতে তৈরি কাপড়, নকশিকাথা, মাদুর ইত্যাদি হলো দৈনন্দিন প্রয়োজনে ব্যবহার্য নানান অনুযজ। সোনা-রুপা দিয়ে তৈরি কানের দুল, গলার মালা, হাতের চুড়ি ইত্যাদি অলংকার রূপে ব্যবহৃত হয়। তাঁতে তৈরি কাপড় যেমন: শাড়ি, লুজি, চাদর, গামছা পরিধেয় বস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও গৃহসজ্জায় কুটির পণ্যের প্রতি মানুষের প্রবল চাহিদা রয়েছে।

[প্রশ্ন-৫৮ কুটির শিল্পকে কেন কুটির শিল্প বলা হয়? এ শিল্পের কয়েকটি উদাহরণ দাও? (অনুধাবন)]

উত্তর: কুটির শিল্প বলতে কুটিরে বা সাধারণত পারিবারিক পরিবেশে পণ্য উৎপাদন করাকে বোঝায়। এ ধরনের পণ্য হাতে বা অল্প কিছু যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদিত হয়। কুটিরে উৎপন্ন হয় বলেই একে কুটির শিল্প বলা হয়। কুটির শিল্পের কয়েকটি উদাহরণ হলো— জামদানি শাড়ি, তাঁতের শাড়ি, শীতলপাটি, শতরঞ্জি, নকশিকাথা, হাতপাখা, গয়না ইত্যাদি। দৈনন্দিন নানা প্রয়োজনে এসব কুটির পণ্য ব্যবহার করা হয়। নাগরিক মানুষের প্রবল চাহিদার কারণে বর্তমানে বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে কুটির পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান।

[প্রশ্ন-৫৯ বাংলাদেশের কুটির শিল্পের ইতিহাস সম্পর্কে লেখো। (অনুধাবন)]

উত্তর: বাংলাদেশি কুটির শিল্পের রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। চৌদ্দ শতকে ইবনে বতুতা বাংলাদেশে ভ্রমণ করতে এসেছিলেন। তাঁর বিবরণে বাংলার সন্মুখ কুটির শিল্পের কথা উল্লেখ আছে। ইতিহাসের পাতায় দেখা যায় মোগল সম্রাট ও বেগমরা সূক্ষ্ম সূতা দিয়ে বোনা মসলিন কাপড় ব্যবহার করতেন। অতীতে আরব ও ইউরোপের বণিকেরাও ব্যবসার উদ্দেশ্যে মসলিন কাপড় কিনে নিয়ে যেতেন। বর্তমানে কুটির পণ্য শুধু কুটিরে তৈরি হয় না। কারখানাতেও এসব জিনিস তৈরি করা হয়।

[প্রশ্ন-৬০ কুটির শিল্পের উপকরণ সম্পর্কে আলোচনা করো। (উচ্চতর দক্ষতা)]

উত্তর: নানা প্রাকৃতিক উপকরণ দিয়ে কুটির শিল্প তৈরি করা হয়। মাটি দিয়ে তৈরি হয় থালা-বাটি, পুতুল, হাড়ি-পাতিল ইত্যাদি। বাঁশ দিয়ে তৈরি হয় বেড়া, কুড়ি, মোড়া, চালুনি প্রভৃতি। বেত দিয়ে তৈরি হয় চেয়ার, টেবিল, দোলনা প্রভৃতি। পাট দিয়ে তৈরি হয় বস্ত্র, দড়ি, পাপোশ, শিক। সোনা-রুপা দিয়ে বানানো হয় কানের দুল, গলার মালা, হাতের চুড়ি। বাংলাদেশের কুটির শিল্পে মাটি, বাঁশ ও বেত দিয়ে তৈরি পণ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। মাটি দিয়ে থালা-বাটি, হাড়ি-পাতিল, লতি-মোড়া ও পুতুল ইত্যাদি জিনিস বানানো হয়। ঐশ্বর্যপাতা ও বেতের চটা দিয়ে পাটি বানানো হয়। মূর্তা গাছ দিয়ে বানানো হয় শীতলপাটি। মেঝেতে কাপড় পেড়ে তৈরি হয় নকশিকাথা। তালপাতা, বাঁশ, ও বেতের চটা, কাপড় ইত্যাদি দিয়ে হাতপাখা বানানো হয়। এছাড়াও গ্রামীণ আরও নানা উপকরণ দিয়ে কুটির পণ্য তৈরি হয়।

[প্রশ্ন-৬১ বাংলাদেশের কুটির শিল্পে মাটি, বাঁশ ও বেত দিয়ে তৈরি পণ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে লেখো। (উচ্চতর দক্ষতা)]

উত্তর: বাংলাদেশের কুটির শিল্পে মাটি, বাঁশ ও বেত দিয়ে তৈরি পণ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। মাটি দিয়ে থালা-বাটি, হাড়ি-পাতিল, হাতি-মোড়া, পুতুল ইত্যাদি জিনিস বানানো হয়। এসব পণ্য শুধু গৃহস্থালির কাজে নয় বরং গৃহের শোভা বৃদ্ধিতেও ব্যবহৃত হয়। বাঁশ দিয়ে বেড়া, কুড়ি, কুলা, চালুনি ও মোড়া বানানো হয়। আর বেত দিয়ে তৈরি করা হয় চেয়ার, টেবিল, দোলনা, বই রাখার তাক ও ধাম। এসব পণ্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনে খুব প্রয়োজনীয়। গ্রামীণ শিল্পীদের হাতে এসব জিনিস আকর্ষণীয় রূপ পায়। এ পণ্যগুলো আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক। বর্তমানে শহরেও এসব কুটির পণ্যের চাহিদা বাড়ছে।

[প্রশ্ন-৬২ আমার বাড়িতে কী কী কুটির পণ্য আছে তার তালিকা করি। (প্রয়োগ)]

উত্তর: আমার বাড়িতে নানান রকমের কুটির পণ্য আছে। যেমন:

১. মাটি ও কাঁসার তৈরি থালা,
২. শাড়ি, গামছা ও চাদর,
৩. মাটির হাড়ি,
৪. বাঁশের কুড়ি, কুলা, চালুনি,
৫. সোনার কানের দুল, গলার মালা,
৬. রুপার নূপুর,
৭. কাপড়ের হাতপাখা,
৮. নকশিকাথা ও জামদানি শাড়ি।

পাঠ ১২ শিল্পের সাধনা

[প্রশ্ন-৬৩ একলব্যের আজন্মের লালিত ইচ্ছাটি কী ছিল এবং কার কাছে তির চালনা শিখলে তার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হতো বলে সে বিশ্বাস করত? (উচ্চতর দক্ষতা)]

উত্তর: 'শিল্পের সাধনা' গল্পের একলব্য ছিল বনের এক সাধারণ শিকারির ছেলে। তার মনের আজন্ম লালিত ইচ্ছা ছিল একজন মস্ত বড়ো বীর হওয়া। ছোটবেলা থেকেই তির-ধনুক চালনায় তার হাতের নিশানা ছিল অব্যর্থ। সে শুনছিল গুরু দ্রোণ রাজপুত্রদের তির চালনা শিক্ষা দেন। একলব্য বিশ্বাস করত গুরু দ্রোণের শিষ্য হতে পারলে তার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। এই আশা নিয়েই সে একদিন রাজবাড়ির মাঠে ছুটে গেল। কিন্তু শিকারিপুত্র হওয়ায় গুরু দ্রোণ তাকে নিজের শিষ্য করতে রাজি হননি। অবশেষে দ্রোণকে গুরু মেনে কঠোর সাধনায় তার ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

[প্রশ্ন-৬৪ একলব্য বীর হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে দ্রোণাচার্যের কাছে গেলেও কেন পরিস্থিতি তাকে দূর থেকে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করল? (উচ্চতর দক্ষতা)]

উত্তর: একলব্যের তীব্র বাসনা ছিল মস্ত বীর হওয়ায়। তাই মনের এই বাসনা নিয়ে সে একদিন ছোট্ট গুরু দ্রোণের কাছে। সে সাহসে বুক বেঁধে রাজবাড়ির বিশাল মাঠে সোজা ঢুক পড়ে। সেখানে রাজপুত্ররা মনোযোগ দিয়ে ধনুক থেকে তির ছোড়ার কঠিন অনুশীলন করছিল। তাদের গুরু দ্রোণ মাঠের এক পাশে বসে তাদের দেখছিলেন। একলব্য এককোণে দাঁড়িয়ে মুখ হয়ে রাজপুত্রদের সেই তির ছোড়া দেখতে লাগল। কিন্তু সে ছিল বনের এক অতি সাধারণ ও দরিদ্র শিকারির ছেলে। তাই রাজপুত্রদের এমন অনুশীলন দেখে তার গুরুর কাছে যাওয়ার সাহস হলো না।

[প্রশ্ন-৬৫ একলব্যের মনের সপ্ত ইচ্ছাটি কী ছিল এবং তার মুখ কেন মলিন হয়ে গিয়েছিল 'শিল্পের সাধনা' গল্প অবলম্বনে ব্যাখ্যা করো। (অনুধাবন)]

উত্তর: একলব্যের তীব্র ইচ্ছা ছিল সে একজন মস্ত বড়ো বীর বা তিরন্দাজ হবে। সে গুরু দ্রোণের অলৌকিক তির চালনার দক্ষতার কথা শুনছিল। নিজের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্য নিয়ে সে সাহস করে একদিন রাজবাড়ির মাঠে প্রবেশ করে। সে অত্যন্ত বিনীতভাবে গুরু দ্রোণের নিকট তিরবিদ্যা শেখার আবেদন জানায়। কিন্তু তৎকালীন সমাজব্যবস্থার নিয়ম অনুযায়ী গুরু দ্রোণ কেবল রাজকুমারদেরই ধনুবিদ্যা শিক্ষা দিতেন। একলব্য একজন সাধারণ শিকারির সন্তান হওয়ায় দ্রোণ তাকে তির চালনা শেখাতে অস্বীকৃতি জানান। গুরুর এই প্রত্যাখ্যানের কথা শুনে একলব্যের মুখ কালো হয়ে যায়। তাই আশা ভাঙা হওয়ায় একলব্যের মুখ পুরোপুরি মলিন হয়ে গিয়েছিল।

[প্রশ্ন-৬৬ 'আমি শুধু রাজকুমারদের শেখাই।'— কথটি কে, কাকে এবং কেন বলেছিল? 'শিল্পের সাধনা' গল্পের আলোকে ব্যাখ্যা করো? (প্রয়োগ)]

উত্তর: প্রমোক্ত কথটি গুরু দ্রোণ বনের শিকারির পুত্র একলব্যকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন। একলব্য মস্ত বড়ো বীর হওয়ার বাসনা নিয়ে রাজবাড়ির মাঠে প্রবেশ করেছিল। সে সেখানে গিয়ে পরম উৎসাহে রাজপুত্রদের তির ছোড়ার অনুশীলন দেখছিল। তখন গুরু দ্রোণ একলব্যকে কৌতূহলী হয়ে আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করেন। একলব্য অত্যন্ত বিনীতভাবে তাঁর কাছে তির চালনা শেখার কথা জানায়। কিন্তু একলব্য রাজবংশের কেউ নয় জেনে দ্রোণ কিছুটা বিরক্ত হয়ে যান। তৎকালীন কঠোর নিয়ম অনুযায়ী তিনি একলব্যকে শিক্ষা দিতে অস্বীকৃতি জানান। বিদায় দেওয়ার উদ্দেশ্যে তখন তিনি একলব্যকে এই কঠোর কথটি বলেছিলেন।

[প্রশ্ন-৬৭] কোন অলৌকিক ধনুর্বিদ্যার কৌশল প্রত্যক্ষ করে তৃতীয় রাজপুত্র মাঠে নাক্ষত্রিক বাবুস্বামী বা থ হয়ে গিয়েছিল? (অনুধাবন)

উত্তর: 'শিমোর সাধনা' গল্পে একটি অলৌকিক ধনুর্বিদ্যার চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায়। তৃতীয় রাজপুত্রের শিকারি কুকুরটি হঠাৎ বন থেকে ফিরে আসে। কুকুরটির মুখে দেখে তৃতীয় রাজপুত্র ভীষণ অবাক হয়ে যায়। সে দেখল কুকুরের মুখের চারপাশে চমৎকারভাবে পাঁচটি তির বিধে রয়েছে। তিরের কারণে কুকুরটি মুখ খুলে আর কোনো শব্দ করতে পারছিল না। অথচ আশ্চর্য বিষয় হলো কুকুরের মুখে এক ফোঁটা রক্তও ছিল না। এমনকি তার শরীরে কোনো যন্ত্রণার বা কষ্টের লক্ষণও দেখা যাক্ষিল না। এমন অবিস্বাস্য ও নিখুঁত তির চালনার কৌশল দেখেই রাজপুত্র বাবুস্বামী বা থ হয়ে গিয়েছিল।

[প্রশ্ন-৬৮] একলব্যের অদ্ভুত তির চালনার কৌশলের সঙ্গে গুরু দ্রোণের নামের সম্পর্ক জানে রাজপুত্র বিস্মিত হওয়ার কারণ কী? (প্রয়োগ)

উত্তর: রাজপুত্র একলব্যের কাছে অদ্ভুত তির ছোড়ার কথা জানতে পেরে তার গুরুর নাম জানতে চাইল। তখন একলব্য বিনীতভাবে উত্তর দিলো সে গুরু দ্রোণের কাছে শিখেছে। এই পরিচিত নাম শুনে রাজপুত্র ভীষণ চমকে উঠল এবং অবাক হলো। কারণ গুরু দ্রোণ ছিলেন স্বয়ং সেই রাজপুত্রেরও একমাত্র গুরু। অথচ এমন অসাধারণ ও নিখুঁত বিদ্যা দ্রোণ তাকে কখনো শেখাননি। তাছাড়া দ্রোণ রাজপুত্র ছাড়া অন্য কোনো সাধারণ মানুষকে তির চালনা শেখাতেন না। এই বিপরীত বাস্তবতার কথা চিন্তা করেই রাজপুত্র ভীষণভাবে বিস্মিত হলো।

[প্রশ্ন-৬৯] 'আমি আপনার শিষ্য একলব্য।'— উক্তিটি কার? সে কখন এবং কোন পরিস্থিতিতে বস্তা গুরুর পায়ের ধূলা নিয়ে এই পরিচয় দিয়েছিল? (প্রয়োগ)

উত্তর: 'আমি আপনার শিষ্য একলব্য।'— কথাটি একলব্য গুরু দ্রোণকে বলেছিল। কুকুরের মুখে আশ্চর্য তিরের আক্রমণ দেখে তৃতীয় রাজকুমার অবাক হয়। তারপর তিরন্দাজের মুখে দ্রোণের নাম শুনে রাজকুমার আরও বেশি বিস্মিত হয়। তৃতীয় রাজপুত্র যখন গুরু দ্রোণকে নিয়ে একলব্যের কাছে গেল। তখন পরম পূজনীয় গুরু দ্রোণকে দেখে একলব্য হাতের তির-ধনুক ফেলে ছুটে আসে। সে গুরুর কাছে গিয়ে ভক্তিভরে পায়ের ধূলা নিয়ে প্রণাম করল। নিজের পরিচয় প্রকাশ করে পরম শ্রদ্ধায় সে তখন প্রস্রোক্ত কথাটি বলেছিল।

[প্রশ্ন-৭০] শিকারি কুকুরকে আঘাতকারী তিরন্দাজকে খুঁজতে গিয়ে বনের নির্জন পরিবেশে রাজপুত্র কী আবিষ্কার করল? (প্রয়োগ)

উত্তর: শিকারি কুকুরের মুখে তিরবিন্দু দেখে তৃতীয় রাজপুত্র বনের ভিতর রওনা হলো। নির্জন বনে খুঁজতে খুঁজতে সে এক অদ্ভুত পরিবেশ আবিষ্কার করল। সেখানে বনের মাঝে উঠানের মতো একফালি জায়গা ছিল। সেই সুন্দর জায়গার চারপাশে লতাপাতার চমৎকার বেড়া ছিল। সেখানে একমনে তির চালনার অনুশীলন করছে এক যুবক। কোনো দিকেই ধ্যানমগ্ন সেই যুবকের বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই। নির্জন বনের লতাপাতার ঘেরা প্রাঙ্গণে সে তির ছুড়ছিল। তৃতীয় রাজপুত্র অবাক হয়ে তার অনন্য তির চালনা দেখতে লাগল।

[প্রশ্ন-৭১] 'মনে মনে আপনাকে গুরু মেনে আমি এতদিন অনুশীলন করেছি।'— একলব্য কেন গুরু দ্রোণকে উদ্দেশ্য করে এই গভীর অনুভূতির কথা বলেছিল? (অনুধাবন)

উত্তর: একসময় একলব্য গুরু দ্রোণের কাছে ধনুর্বিদ্যা শেখার তীব্র আকুলতা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু সাধারণ ঘরের সন্তান হওয়ায় দ্রোণ তাকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করেননি। তবে সে দ্রোণকে মনে মনে নিজের গুরু বলে মানত। বনের ভিতর তৃতীয় রাজপুত্র একলব্যের মুখে এই কথাটি শুনছিল। তখন তৃতীয় রাজপুত্র মথগুরু দ্রোণকে একলব্যের সামান্য নিয়ে যায়। হঠাৎ গুরু দ্রোণকে নিজের সামনে দেখে একলব্য অভিভূত হয়। সে পরম শ্রদ্ধায় ধনুর্বিদ্যার গুরুর পায়ের ধূলা নিল। তখন সে গুরুর চরণে হাত দিয়ে প্রণাম করল। পরম ভক্তিতে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে সে কথাটি বলেছিল।

[প্রশ্ন-৭২] একলব্যের মনে মনে দ্রোণকে গুরু মানা এবং নিবিড় অনুশীলনের মাধ্যমে সেরা তিরন্দাজ হওয়ার প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করো। (প্রয়োগ)

উত্তর: একলব্যের তীব্র ইচ্ছা ছিল মস্ত বড়ো বীর হওয়ায়। তাই সে তির চালনা শিখতে গুরু দ্রোণের কাছে যায়। কিন্তু দ্রোণ শুধু রাজপুত্রদের তির চালনা শেখাতেন। এই নিয়মের কারণে দ্রোণ একলব্যকে ফিরিয়ে দেন। প্রত্যাখ্যাত হয়েও একলব্য কিন্তু দমে যায়নি। সে মনে মনে দ্রোণকে পরম গুরু মেনে নেয়। গভীর বনে সে একাগ্রচিত্তে নিখুঁত অনুশীলন শুরু করে। এমন নিবিড় অনুশীলনের মাধ্যমেই সে সেরা তিরন্দাজ হয়ে উঠেছিল।

পাঠ ১৩) পাখির মতো

[প্রশ্ন-৭৩] 'পাঠে আমার মন বসে না/ কাঁঠালচাঁপার গন্ধে।'— এই চরণের আলোকে কবির পড়ায় মন না বসার কারণ বুঝিয়ে লেখো। (অনুধাবন)

উত্তর: কবি ঘরের চার দেওয়ালে বন্দি হয়ে পড়তে চান না। ঘরের বাইরে ফুটে থাকা কাঁঠালচাঁপা ফুল কবিকে টানে। বাতাসের সঙ্গে সেই ফুলের মিষ্টি সুবাস ঘরে আসে। এই মনোমুগ্ধকর সুগন্ধ কবির মনকে উদাস করে দেয়। প্রকৃতির অমোঘ আকর্ষণ কবির মনকে চঞ্চল করে তোলে। তখন পড়ার টেবিলে কবির মন আর বসতে চায় না। বইয়ের পাতার চেয়ে বাইরের মুক্ত প্রকৃতি বেশি আকর্ষণ করে কবিকে। মূলত সুবাসের তীব্র আকর্ষণে কবির পড়ালেখায় মন বসে না।

[প্রশ্ন-৭৪] 'বকুল ডালে লুকিয়ে থেকে/ পাখির মতো ডাকতে।'— কবির এমন ইচ্ছা জাগার কারণ কী? (অনুধাবন)

উত্তর: কবি চার দেওয়ালের বন্দি জীবন পছন্দ করেন না। তিনি প্রকৃতির মাঝে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে ভালোবাসেন। বকুল গাছের সবুজ ডালপালাই কবির সবচেয়ে প্রিয় জায়গা। গাছের পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকার আনন্দ অনেক বেশি। সেখানে বসে পাখির সুর নকল করে ডাকতে ইচ্ছে করে। প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যাওয়ার তীব্র ইচ্ছা কবির মনে জাগে। মুক্ত আকাশ ও বনের পাখি কবিকে প্রবলভাবে টানে। মূলত মুক্তভাবে বাঁচার অদম্য আকাঙ্ক্ষায় কবির এমন ইচ্ছা জাগে।

[প্রশ্ন-৭৫] সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর আকাশে কীসের সৃষ্টি হয় এবং তা দেখে কবির মনে কী ইচ্ছা জাগে? (প্রয়োগ)

উত্তর: গভীর রাতে সবাই কর্ণফুলী নদীর তীরে ঘুমিয়ে পড়ে। সেসময় কবির কল্পনায় এক মায়াবী জগৎ তৈরি হয়। আকাশজুড়ে তখন পূর্ণিমার গোল চাঁদটি দেখা যায়। অদৃশ্য ফেরেশতার এসে বেন চাঁদের বাটিটা উল্টে দেয়। তখন চারদিকের প্রকৃতিতে চাঁদের উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়ে। এই রূপালি আলোয় নদীর পাড় আরও সুন্দর হয়ে ওঠে। রূপময় পরিবেশ দেখে কবির তখন পাখি হয়ে ওড়ার ইচ্ছা জাগে। মূলত রাতের প্রকৃতির অপবূর্ণ রূপ এখানে প্রকাশ পেয়েছে।

[প্রশ্ন-৭৬] 'কেমন করে শহর ছেড়ে/ সবুজ গায়ে ঘুরব।'— কবির এই আকুলতা কেন? নাগরিক জীবনের সঙ্গে তুলনা করে বুঝিয়ে লেখো। (প্রয়োগ)

উত্তর: শহরের যান্ত্রিক কোলাহলপূর্ণ জীবন কবির ভালো লাগে না। নাগরিক জীবনের চার দেওয়ালের বন্দিদশায় কবি খুব ইপ্সিয়ে ওঠে। এখানে চারদিকে শুধু বড়ো বড়ো দালান আর ইট-পাথর দেখা যায়। শহরের কৃত্রিম পরিবেশের বিপরীতে গ্রামের প্রকৃতি অনেক শান্ত ও মায়াবী। গ্রামের উন্মুক্ত নীল আকাশ ও সবুজ প্রান্তর কবিকে টানে। সেখানে মুক্ত বাতাসে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ানো সহজ হয়। প্রকৃতির সেই সতেজ ও শান্তিময় কোলে ফেরার তীব্র ব্যাকুলতা কবির মাঝে লক্ষ্য করা যায়। মূলত নাগরিক জীবনের ক্লান্তি দূর করতেই কবির এই আকুলতা।

[প্রশ্ন-৭৭ 'সবাই পড়া শিখছে মানুষ হওয়ার জন্য কিন্তু কবি পাখির মতো বন্য হতে চান'— কথটি 'পাখির মতো' কবিতার আলোকে বুঝিয়ে লেখো। (উচ্চতর দক্ষতা)

উত্তর: প্রকৃতির প্রতি গভীর টান থাকায় কবির পড়ায় মন বসে না। বাবা-মা পড়তে বললেও কঁঠালটাপার গন্ধে তাঁর মন স্থির থাকে না। সবাই মানুষ হওয়ার জন্য পড়াশোনা শিখলেও কবি তা চান না। তিনি পাখির মতো স্বাধীন হয়ে মুক্ত প্রকৃতিতে উড়তে চান। নিয়মের শৃঙ্খলে ঘরের চার দেওয়ালে কবি বন্দি থাকতে চান না। তিনি বনের পাখির মতো মুক্ত জীবনকে বেশি পছন্দ করেন। মূলত সহজাত স্বাধীনতা বজায় রাখতেই কবির মনে এই ইচ্ছা জাগে। প্রকৃতির কোলে ভালোভাবে বেঁচে থাকাটাই কবির কাছে আসল আনন্দ।

[প্রশ্ন-৭৮ 'পাখির মতো' কবিতায় কবির ভাবনার জগৎটি কেমন এবং তিনি কেন এমন ভাবেন? (অনুধাবন)]

উত্তর: পড়াশোনায় মন না রসায় কবি মনে মনে অনেক কিছু ভাবেন। তিনি ভাবেন কীভাবে পাখির মতো ডানা মেলে আকাশে উড়বেন। তিনি আরও ভাবেন কীভাবে যান্ত্রিক শহর ছেড়ে গ্রামে ঘুরবেন। কবির কাছে শহরের চার দেওয়ালের জীবন খুব সীমাবদ্ধ মনে হয়। তিনি প্রকৃতির মাঝে পাখির মতো মুক্তভাবে বেঁচে থাকতে চান। প্রচলিত নিয়মে মানুষ হওয়ার চেয়ে বন্য পাখি হওয়া ভালো। মুক্ত পরিবেশের তীব্র আকর্ষণে কবি সারাক্ষণ এসব কথা ভাবেন। মূলত স্বাধীনতার অদম্য আকাঙ্ক্ষা থেকেই কবি এমন কল্পনা করেন।

পাঠ ১৪ কুপোকাত

[প্রশ্ন-৭৯ খরগোশ কেন বাঘের কাছে যেতে চাইল না? (অনুধাবন)]

উত্তর: খরগোশ নিজের জীবনকে ভালোবাসে বলে বাঘের কাছে গিয়ে মরতে চায় না। বনে ছিল এক ভয়ংকর বাঘ। বাঘের অত্যাচারে বনের অন্যান্য পশুদের জীবন বিপন্ন হতে চলেছে। তার অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য বনের পশুরা একত্রিত হয়। সবার অনুরোধে শেয়াল বাঘের সাথে একটি চুক্তি করে যে প্রতিদিন একটি করে পশু বাঘকে খাদ্য হিসেবে উপহার দিবে। তাহলে বাঘ তার অত্যাচার বন্ধ করবে। চুক্তি অনুসারে প্রথমেই খরগোশের পালা, কিন্তু খরগোশ কিছুতেই বাঘের খাদ্য হতে চায় না বরং নিজেই সুন্দর সুন্দর শাকসবজি খেয়ে বেঁচে থাকতে চায়। অর্থাৎ খরগোশ নিজের জীবনকে ভালোবাসে বলেই বাঘের সামনে গিয়ে সে মরতে চায় না।

[প্রশ্ন-৮০ শেয়াল কেন বাঘের সঙ্গে আপস-রফা করেছিল? বর্ণনা করো। (অনুধাবন)]

উত্তর: বাঘের অত্যাচার থেকে বনের পশুদের বাঁচাতে শেয়াল বাঘের সাথে আপস-রফা করে। বাঘের অত্যাচারে বনের সব প্রাণীর জীবন বিপন্ন হচ্ছিল। বাঘ প্রতিদিন নির্বিচারে বহু প্রাণী হত্যা করে। কিছু খায় আর কিছু ফেলে রাখে। সবাই এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজতে থাকে। সকলে মিলে শেয়ালকে অনুরোধ করে বাঘের সাথে কথা বলার জন্য। সকলের অনুরোধে শেয়াল বাঘের সাথে একটি আপস-রফা করে। সেই রফা অনুসারে প্রতিদিন বাঘকে খাবারের জন্য একটি করে পশু উপহার দিবে। তাহলে বাঘ আর এই ধরনের হত্যাকাণ্ড চালাবে না।

[প্রশ্ন-৮১ শজাবুর মতো বাঘের জন্য তাকে নির্বাচন করা কেন ঠিক হবে না? আলোচনা করো (প্রয়োগ)]

উত্তর: শজাবুর সর্বাত্মক কাঁটা এবং চেহারা বিদ্যুটে হওয়ায় শজাবু মনে করে তাকে নির্বাচন করা ঠিক হবে না। বাঘের হাত থেকে বাঁচার জন্য বাঘের সাথে শেয়ালের আপস-রফা অনুসারে প্রথমেই খরগোশের জীবন উৎসর্গ করার কথা। কিন্তু আপত্তি থাকায় সকলেই তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে। শজাবুও খরগোশকে বোঝায়। মূলত শজাবু নিজেও মরতে চায় না বলে চতুর এক যুক্তি খাটায়। সে সবাইকে বোঝায় তার পুরো শরীরে কাঁটা আর চেহারাও বিদ্যুটে। বাঘ তাকে খাওয়ার বদলে বরং বিরক্ত হবে। যার ফলে বনের অন্য পশুদের ওপর বিপদ বাড়তে পারে। তাই তাকে বাঘের জন্য নির্বাচন করা কখনোই ঠিক হবে না।

[প্রশ্ন-৮২ ময়ূরকে কেন বাঘের কাছে পাঠানো উচিত হবে না? বর্ণনা করো। (উচ্চতর দক্ষতা)]

উত্তর: ময়ূর মনে করে বেশি সুন্দর বলে বাঘের কাছে তাকে পাঠানো উচিত হবে না। বাঘের সামনে যাওয়ার প্রাণে ময়ূরকে কেন পাঠানো উচিত নয় সেই যুক্তি তুলে ধরে। অনেক বেশি সুন্দর হওয়ার অসুবিধা অনেক। সে মনে করে তাকে সামনে গেলে বাঘ খাওয়ার কথা ভুলে যেতে পারে। তার শোভায় মুগ্ধ হয়ে তাকে খেতে চাইবে না। কারণ সুন্দর জিনিস খাওয়া চলে না বরং সৌন্দর্যে সবাই মুগ্ধ হয়। বাঘও মুগ্ধ হয়ে ময়ূরকে খাবে না। এতে অন্য পশুদের আরও বিপদ বাড়তে পারে। তাই সে মনে করে, সকলের নিরাপত্তার কথা ভেবে ময়ূরকে বাঘের কাছে পাঠানো উচিত হবে না। মূলত ময়ূর নিজেকে বাঁচানোর জন্যই যুক্তিগুলো উপস্থাপন করে।

[প্রশ্ন-৮৩ খরগোশ মাথা নিচু করে কান্দার পিছনে কী কারণ ছিল বলে তুমি মনে করো? (উচ্চতর দক্ষতা)]

উত্তর: বাঘকে বোকা বানানোর জন্য খরগোশ মাথা নিচু করে কান্দে বলে আমি মনে করি। খরগোশ বাঘকে বোকা বানানোর বুদ্ধি করে বাঘের সামনে উপস্থিত হয়। তাই প্রথমেই সে মাথা নিচু করে কান্নার ভান করতে থাকে। যাতে বাঘের রাগ শান্ত হয় এবং তার কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। খরগোশের মূল উদ্দেশ্য ছিল বুদ্ধি ও কৌশল ব্যবহার করে নিজের কার্য সিদ্ধি করা। কান্নার ভান করা খরগোশের একটি কৌশল ছিল মাত্র। আর এই কৌশলে খরগোশ শেষ পর্যন্ত বাঘকে বোকা বানিয়ে শান্তি দিতে পেরেছে।

[প্রশ্ন-৮৪ বাঘ তার জাত ভাইটির ওপর কেন ক্ষেপে যায়? আলোচনা করো। (অনুধাবন)]

উত্তর: বাঘের মুখের খাবার কেড়ে নেওয়ার কথা শুনে সে তার জাত ভাইটির উপর ক্ষেপে যায়। খরগোশ বাঘকে বোকা বানানোর জন্য একটি বানোয়াট গল্প সাজায়। খরগোশ বাঘকে বলে তার সেজ আপা বাঘের খাদ্য ছিল কিন্তু তার জাত ভাই তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে নিজে খেয়ে ফেলেছে। আর তাই সেজ আপার বদলে তাকে বাঘের সামনে আসতে হয়েছে। এমন কথা শুনে বাঘ ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং তার জাত ভাইটির ঘাড় মটকাতে চায়। এছাড়া রক্ত, হাড়, মাংস সব একসঙ্গে মিশিয়ে লোকমা লোকমা খেয়ে নিজের রাগকে শান্ত করতে চায়।

[প্রশ্ন-৮৫ বাঘ কেন কুয়ার মধ্যে লাফ দিলো? (অনুধাবন)]

উত্তর: অন্য বাঘ মনে করে নিজের প্রতিবন্ধকে শায়েস্তা করতে বাঘ কুয়ার মধ্যে লাফ দেয়। অত্যাচারী বাঘের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য খরগোশ একটি ফাঁদ পাতে। খরগোশ বাঘকে বলে বনের ভিতর আরেকটি বাঘ আছে যে কি না তার সকল খাবার খেয়ে নেয়। এ কথা শুনে বাঘ হিংসার আগুনে জ্বলতে থাকে। সেই কথিত বাঘকে শায়েস্তা করতে খরগোশের সাথে কুয়ার সামনে যায়। কুয়ার পানিতে বাঘ ডুবু ডুবু নিজের মতো আরেকটি বাঘ দেখে। সেই বাঘটিও তার মতো চোখ পাকিয়ে হুমকি দিচ্ছে। তা দেখে বাঘের রাগ আরও বেড়ে যায় এবং সেই বাঘকে শায়েস্তা করতে কুয়ার পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মূলত বাঘ বুঝতেই পারেনি যে খরগোশ তাকে বোকা বানিয়ে মৃত্যুফাঁদ পেতে রেখেছে।

[প্রশ্ন-৮৬ নাটিকাটির নাম 'কুপোকাত' নামকরণ কতটা সার্থক হয়েছে? তা বর্ণনা করো। (উচ্চতর দক্ষতা)]

উত্তর: নাটিকাটির কহিনি ও পরিণতির দিক থেকে 'কুপোকাত' নামকরণ সার্থক হয়েছে। বনের রাজা বাঘ প্রতিদিন নির্বিচারে পশু হত্যা করত। তার অত্যাচারে বনের সব পশু আতঙ্কে ছিল। তাই বাঘের সাথে শেয়াল একটা আপস-রফা করে। সিম্ভান্ত হয় প্রতিদিন বাঘকে একটা করে পশু খাবার হিসেবে উপহার পাঠানো হবে। প্রথম দিন বাঘের কাছে যাওয়ার পালা পড়ে খরগোশের। বাঘকে শিক্ষা দিতে ছোটো প্রাণী খরগোশ বুদ্ধি ও কৌশল খাটিয়ে তাকে কুয়ার ধারে নিয়ে যায়। পরবর্তীকালে বাঘ তার নিজের ছায়া দেখে বিভ্রান্ত হয়ে কুয়ার মধ্যে ঝাঁপ দেয়। বাঘ কুয়ার হাবুডুব খেতে খেতে মারা যায়। এভাবেই ছোটো খরগোশের বুদ্ধির কাছে বনের রাজা বাঘ পরাজিত হয় অর্থাৎ বাঘ কুপোকাত হয়। এ থেকেই বোঝা যায়, নাটিকাটির নামকরণ সার্থক হয়েছে।

পাঠ ১৫

সংকল্প

প্রশ্ন-৮৭ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে মানুষ ঘুরছে বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

(অনুধাবন)

উত্তর: যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের এগিয়ে যাওয়াকে বোঝানো হয়েছে। নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই মানুষ এক যুগ থেকে আরেক যুগে উপনীত হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অনেক কিছুর পরিবর্তন হয়। উন্মোচন হয় নতুন নতুন রহস্য ও ঘটনার। মানুষও সময়ের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলে অজানা রহস্য অনুসন্ধান ও ঘটনার মূল উদ্ঘাটনের জন্য। সময়ের পরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের এই এগিয়ে চলাকেই কবি যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে ঘোরা বুঝিয়েছেন।

প্রশ্ন-৮৮ মানুষ কেন দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটেছে? বর্ণনা করো।

(উচ্চতর দক্ষতা)

উত্তর: অজানাকে জানার জন্য মানুষ দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটেছে। 'সংকল্প' কবিতায় মানুষের অজানাকে জানার এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে। কেননা অসীম বিশ্বকে জানার কৌতূহল মানুষের চিরকালের। তাই নতুন নতুন রহস্য উন্মোচনের জন্য তারা এক দেশ থেকে অন্য দেশে ছুটে বেড়ায়। মানুষ অজানাকে জানতে চায়। অদেখাকে দেখতে চায়। আবিষ্কার করতে নতুন নতুন জিনিস। অজানাকে জয় করার দেশাভির ঘর থেকে বাইরে টেনে আনে। মূলত বিশ্বজগৎ নিজের জ্ঞান সমৃদ্ধ করার জন্যই মানুষ দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটে চলছে।

প্রশ্ন-৮৯ সাগরে মানুষ কী কী ধরনের সাহস দেখাচ্ছে? (অনুধাবন)

উত্তর: সাগরে মানুষের বিভিন্ন দুঃসাহসিক অভিযানের কথা 'সংকল্প' কবিতায় বলা আছে। সাহস, দৃঢ় সংকল্প এবং সাগর নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে। কবিতায় মানুষ সাগরের প্রচণ্ড ঢেউকে উপেক্ষা করে যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে ছুটে চলে; সাগরের অতল গভীর থেকে মুক্তা সংগ্রহ করে। মানুষ সাগরের জোয়ার-বান উপেক্ষা করে মানিক বোঝাই সিন্ধু- যান নিয়ে সমুদ্রে এগিয়ে চলে। এককথায় মানুষ সাহসিকতার সঙ্গে সাগরকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে।

প্রশ্ন-৯০ 'সংকল্প' কবিতার কবি কোথায় কোথায় থাকতে চান? (অনুধাবন)

উত্তর: 'সংকল্প' কবিতায় কবির অজানাকে জানার এবং অদেখাকে দেখার প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। কবি মূলত বস্তু ঘরে বসে না থেকে বিশ্ব-জগৎ ঘুরে দেখতে চান। এজন্য তিনি এক দেশে থেকে অন্য দেশে ঘুরে বেড়াতে চান। তিনি ডুব দিয়ে সমুদ্র তলদেশ থেকে মুক্তা আহরণ করতে চান। তিনি আকাশ-বাতাস, চন্দ্র-তারা, সাগর ও পাহাড়ের চূড়ায় যেতে চান। তিনি যেমন আকাশ ফুড়ে উঠতে চান, তেমনই পাতাল ফেড়ে নামতে চান। অর্থাৎ কবি বিশ্বের সব জায়গায় বিচরণ করে অজানা রহস্য উন্মোচন করতে চান।

প্রশ্ন-৯১ কবি হাতের মুঠোয় পুরে কী দেখতে চান? বর্ণনা করো। (অনুধাবন)

উত্তর: কবি হাতের মুঠোয় পুরে বিশ্ব-জগৎকে দেখতে চান। 'সংকল্প' কবিতায় কবি অজানাকে জানার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকে পুরো পৃথিবীটাকে নিজের আয়ত্তে আনতে চান। বিশ্ব-জগতের কোথায় কী ঘটছে তা দেখার ও জানার অদম্য ইচ্ছা কবির। পৃথিবীর সকল অজানা রহস্যকে কবি আবিষ্কার করতে চান। তিনি মনে করেন, সাহস ও কৌতূহল থাকলে পৃথিবীর সবকিছুকে হাতের মুঠোয় আনা সম্ভব। তাই কবি ঘরে বসে না থেকে বিশ্ব-জগতের সবকিছু ঘুরে দেখতে চান। সুতরাং কবি বিশ্ব-জগৎকে খুব কাছে থেকে দেখতে চান বলে হাতের মুঠোয় বিশ্ব-জগৎকে পুরতে চান।

প্রশ্ন-৯২ কবির সংকল্প কী এবং তিনি তা কীভাবে পূরণ করবেন? আলোচনা করো। (প্রয়োগ)

উত্তর: কবি ঘরে বসে না থেকে পুরো বিশ্বটাকে দেখার সংকল্প পোষণ করেছেন। 'সংকল্প' কবিতায় কবির অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও অজানাকে জানার সংকল্প ফুটে উঠেছে। তিনি বস্তু ঘরে না থেকে বিশ্ব-জগৎটাকে ঘুরে দেখবেন। দেশ থেকে দেশান্তরে মানুষ কেন ছুটে বেড়ায় তিনি সেই রহস্য ভেদ করবেন। বীর ভুবুরিদের সমুদ্রের তলদেশ থেকে মুক্ত আহরণের দুঃসাহসিক অভিযান দেখবেন। তিনি এই সংকল্প পূরণ করবেন অজানার পথ পাড়ি দিয়ে। কবি আকাশ ফুড়ে মহাকাশে যাবেন

এবং পাতাল ফেড়ে নিচের রহস্য সম্পর্কে জানবেন। মোটকথা অদম্য ইচ্ছাশক্তি এবং বীরত্বের সঙ্গে বিশ্ব-জগৎকে আয়ত্তে আনার মাধ্যমে কবি তাঁর সংকল্প পূরণ করবেন।

প্রশ্ন-৯৩ তুমি কীভাবে বিশ্ব-জগৎ দেখতে চাও তা বর্ণনা করো।

(উচ্চতর দক্ষতা)

উত্তর: আমি দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে বিশ্ব-জগৎটাকে দেখতে চাই। পৃথিবীর নানান প্রান্তে নতুন নতুন আবিষ্কারগুলো আমাকে মুগ্ধ করে। সেই আবিষ্কারগুলো যারা করছেন যেভাবে করছেন সেসব নিজের চোখে দেখার স্বপ্ন। মানুষ কেন অসীমে, অতলে ছুটেছে সে বিষয়টি বুঝতে চাই। বীরেরা কেন জীবন বিপন্ন করে মুক্তাকে বরণ করে তা জানতে চাই। জানতে চাই দুঃসাহসীরা কীভাবে আকাশে উড়ছে এবং কীভাবে ভুবুরিরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সমুদ্রের তলদেশ থেকে মুক্তা আহরণ করে তা পর্যবেক্ষণ করে। সর্বোপরি আমি ঘুরে বেড়াতে চাই দেশ হতে দেশান্তরে।

পাঠ ১৬

স্মরণীয় যারা বরণীয় যারা

প্রশ্ন-৯৪ ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা এদেশে কী করেছিল? বর্ণনা দাও। (অনুধাবন)

উত্তর: ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ গভীর রাতে পাকিস্তানি সেনারা এ দেশে আক্রমণ চালায়। তারা ঢাকার নিরস্ত্র ও দুঃস্ত মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আক্রমণ চালায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে, পুলিশ ব্যারাকে ও বিভিন্ন আবাসিক এলাকায়। নির্বিচারে হত্যা করে এ দেশের দুঃস্ত মানুষকে। দীর্ঘ নয় মাস ধরে তারা এ হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যায়। তারা পরিকল্পনা করে একে একে হত্যা করে এদেশের মেধাবী, আলোকিত, বুদ্ধিজীবী ও বরণ্য মানুষদের। পঁচিশে মার্চের মধ্যরাতেই শহিদ হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এম. মুনিরুজ্জামান, অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব, লেখক ও সাংবাদিক শহীদ সাবের, সেলিনা পারভীন প্রমুখ।

প্রশ্ন-৯৫ 'তারা পরিকল্পনা করে একে একে হত্যা করে এ দেশের মেধাবী, আলোকিত, বুদ্ধিজীবী ও বরণ্য মানুষদের।'— ব্যাখ্যা করো। (অনুধাবন)

উত্তর: পাকিস্তানি সেনারা এ দেশকে মেধাশূন্য করতে চেয়েছিল। তারা জানত চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ ও সৃষ্টিশীল মানুষদের হত্যা করলে এ দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। এজন্য তারা এ দেশের মেধাবী সন্তান, লেখক, শিক্ষাবিদসহ বহু গুণী লোকদের হত্যা করেছিল। তারা সংবাদপত্র অফিসে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ধেরেছিল সাংবাদিকদের। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গীতিকার, সমাজসেবী, আইনজীবী, চিকিৎসক প্রভৃতি বুদ্ধিজীবীদের তারা বাছাই করে হত্যা করে। তাদের একমাত্র লক্ষ ছিল এ দেশের ভবিষ্যৎ নষ্ট করা।

প্রশ্ন-৯৬ কোন শহিদ বুদ্ধিজীবী প্রথম পাকিস্তানি গণপরিষদে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান? তাঁর সম্পর্কে বলো ও লেখো।

(অনুধাবন)

উত্তর: প্রথম পাকিস্তানি হিসেবে গণপরিষদে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান শহিদ বুদ্ধিজীবী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত বাঙালি আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ। তিনি ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের গণপরিষদে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষা ব্যবহারের প্রস্তাব করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাঁকে কুমিল্লার বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে হত্যা করে। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল ৮৫ বছর।

প্রশ্ন-৯৭ এম. মুনিরুজ্জামান এবং অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার পরিচয় দাও। ১৯৭১ সালে তাদের সাথে কী হয়েছিলো? বর্ণনা করো।

(প্রয়োগ)

উত্তর: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন এম. মুনিরুজ্জামান। প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ শুনে তিনি পবিত্র কুরআন পড়া শুরু করেন। কুরআন পাঠরত অবস্থায় তাকে টেনেহিঁচড়ে নিচে নামায় পাকিস্তানি সেনারা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের খ্যাতিমান শিক্ষক ছিলেন অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা। বিজ্ঞানের শিক্ষক এম. মুনিরুজ্জামান যে বাড়িতে থাকতেন তার নিচতলায় তিনি থাকতেন। তাঁকে শত্রুসেনারা টেনেহিঁচড়ে বের করে আনে। এরপর এম. মুনিরুজ্জামানের সাথেই তাঁকে গুলি করে হত্যা করে।

[প্রশ্ন-৯৮ সমাজ ও দেশবাসীর সেবা, মজল ও কল্যাণ কামনার জন্য পরিচিত ছিলেন এমন তিনজন শহিদ বুদ্ধিজীবীর পরিচয় দাও। (অনুধাবন)
উত্তর: সমাজ ও দেশবাসীর সেবা, মজল ও কল্যাণ কামনার জন্য পরিচিত ছিলেন এমন তিনজন শহিদ বুদ্ধিজীবী হলেন অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, রণদাপ্রসাদ সাহা এবং নূতনচন্দ্র সিংহ। অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ দেশবাসীর স্বাস্থ্যসেবার জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সাধনা ঔষধালয়। ৮৪ বছর বয়সি এই মানুষটিকে পাকিস্তানিরা সেনারা হত্যা করে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মজল ও কল্যাণের জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন রণদাপ্রসাদ সাহা। দানশীলতার জন্য লোকে তাঁকে ডাকত ‘দানবীর’ বলে। চট্টগ্রামের বিখ্যাত সমাজসেবক ছিলেন নূতনচন্দ্র সিংহ। ১৯৭১ সালে তাঁদের দুজনকেই পাকিস্তানি সেনারা হত্যা করে।

[প্রশ্ন-৯৯ পাঁচজন শহিদ বুদ্ধিজীবীর নাম লেখো। (জ্ঞান)
উত্তর: ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বরে এবং মার্চ মাসে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অসংখ্য বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে। পাঁচজন শহিদ বুদ্ধিজীবী হলেন— ১. রণদাপ্রসাদ সাহা, ২. শহীদুল্লা কায়সার, ৩. শহীদ সাবের ৪. গোবিন্দচন্দ্র দেব ও ৫. নূতনচন্দ্র সিংহ।

[প্রশ্ন-১০০ আমরা কেন চিরদিন শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণ করব? (প্রয়োগ)
উত্তর: ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনারা পরিকল্পিতভাবে এদেশকে মেধাশূন্য করতে নির্মম হত্যাকাণ্ড চালায়। পঁচিশে মার্চ মধ্যরাত থেকে তারা একে একে হত্যা করে এদেশের মেধাবী, আলোকিত, বুদ্ধিজীবী ও বরণ্য মানুষদের। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মিরপুর ও রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে বহু শহিদ বুদ্ধিজীবীদের লাশ পাওয়া যায়। তাঁরা ছিলেন দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। দেশের স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে তাঁরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁদের আত্মদান আমরা কখনো ব্যর্থ হতে দেবো না। তাই আমরা চিরদিন শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণ করব।

[প্রশ্ন-১০১ কোন দিনটিকে ‘শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস’ হিসেবে পালন করা হয়? বর্ণনা করো? (অনুধাবন)
উত্তর: শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে প্রতিবছরের ১৪ই ডিসেম্বর ‘শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস’ পালন করা হয়। ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ থেকেই পাকিস্তানিরা এদেশের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করতে থাকে। মুক্তিযুদ্ধের একেবারে শেষের দিকে পাকিস্তানিরা বুঝতে পারে যে তাদের পরাজয় অবধারিত। তখন তারা এ দেশকে মেধাশূন্য করার বড়যন্ত্র করে। তারা জানত চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ ও সৃষ্টিশীল মানুষদের হত্যা করলে এ দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। তাই তারা সেই পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর নতুন করে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। তারা একে একে এ দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের ধরে নিয়ে হত্যা করে। এ কারণেই ১৪ই ডিসেম্বর ‘শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস’ পালন করা হয়।

পাঠ ১৭ মাটির নিচে পুরানো নগর

[প্রশ্ন-১০২ কীভাবে উয়ারী-বটেশ্বর প্রাচীন সভ্যতার খোঁজ পাওয়া যায়?
উত্তর: উয়ারী-বটেশ্বর নগরের খোঁজ হঠাৎ করে মেলেনি। এখানকার সাধারণ শ্রমিকরা মাটি কাটার সময়ে এখানে প্রায়ই পুরানো জিনিস পেতেন। ১৯৩৩ সালে প্রথম উয়ারী গ্রামে একটা পাতে জমানো কিছু মূদ্রা পাওয়া যায়। ১৯৫৫ সালে বটেশ্বর গ্রামের শ্রমিকরাও দুটি পুরানো লোহার টুকরা পান। এরপর ১৯৫৬ সালে উয়ারী গ্রামে আবারও মাটি কাটার সময়ে রৌপ্যমূদ্রার একটি ভাঙার পাওয়া যায়। এই ধারাবাহিকতায় ২০০০ সালে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা উয়ারী-বটেশ্বর এলাকায় খননকাজ শুরু করেন এবং প্রাচীন নগরীর সন্ধান পান।

[প্রশ্ন-১০৩ ‘খুবই সমৃদ্ধ ছিল প্রাচীন উয়ারী-বটেশ্বর অঞ্চল।’— কীভাবে এটি বোঝা যায়?
উত্তর: প্রাচীন উয়ারী-বটেশ্বর অঞ্চলের খননকাজে দুর্গ-নগর, ইটের স্থাপত্য, বন্দর, গয়না, মূদ্রা ও মূল্যবান পাথর পাওয়া গেছে। উয়ারী-বটেশ্বরের আশেপাশে প্রায় পঞ্চাশটি পুরানো জায়গার সন্ধান পাওয়া

গেছে। যেমন— রাজার টেক, সোনার তলা, কেন্দুয়া, মরজাল, টজী রাজার বাড়ি, মন্দির ভিটা, জানখার টেক, টজীর টেক। এসব গ্রামে প্রাচীন বসতির চিহ্ন পাওয়া গেছে। ধারণা করা হয়, উয়ারী-বটেশ্বর অঞ্চলটি প্রাচীন কোনো রাজ্যের রাজধানী ছিল। পুরানো সেই নগর সুপরিকল্পিত ছিল। উয়ারী-বটেশ্বরে গড়ে ওঠা সভ্যতা প্রাচীনকালে সোনাগড়া নামে বিশ্বজুড়ে পরিচিত ছিল। এ অঞ্চলের মানুষ ব্রহ্মপুত্র নদী হয়ে সমুদ্রপথে রোমান সাম্রাজ্যের সাথে যোগাযোগ করত। এসব থেকে বোঝা যায় প্রাচীন উয়ারী-বটেশ্বর একসময় খুবই সমৃদ্ধ ছিল।

[প্রশ্ন-১০৪ উয়ারী ও বটেশ্বরে কী কী প্রাচীন নির্দশন পাওয়া গেছে?
উত্তর: উয়ারী ও বটেশ্বর নরসিংদী জেলার দুটি গ্রাম। ধারণা করা হয়, সেখানে খ্রিস্টপূর্ব ছয়-সাত শতকে নগর গড়ে ওঠে। সেই নগর বর্তমানে মাটির নিচে চাপা পড়েছে। এখানকার শ্রমিকরা মাটি কাটার সময় প্রায়ই পুরানো জিনিস পেতেন। ১৯৩৩ সালে উয়ারী গ্রামে একটা পাতে জমানো কিছু রৌপ্যমূদ্রা পাওয়া যায়। ১৯৫৫ সালে বটেশ্বরী গ্রামের শ্রমিকরা দুটি পুরানো লোহার টুকরা পান। ১৯৫৬ সালে রৌপ্যমূদ্রার একটি ভাঙার পাওয়া যায়। ২০০০ সালে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা উয়ারী-বটেশ্বর এলাকার খননকাজ শুরু করেন। তখন মাটির নিচে প্রাচীন দুর্গ-নগরের সন্ধান মেলে। যেখানে পাওয়া যায় ইটের স্থাপত্য, বন্দর, প্রাচীন নগরীর রাস্তা ও গলি। আরও পাওয়া যায় হাতিয়ার, পাথরের পুঁতি, পোড়ামাটির ফলক, মূল্যবান পাথর ও কাচের পুঁতি।

[প্রশ্ন-১০৫ বাংলাদেশের প্রাচীন নগর সম্পর্কে বর্ণনা দাও। (অনুধাবন)
উত্তর: প্রাচীনকালে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নগর গড়ে উঠেছিল। এর মধ্যে সাত-আট শতকের দিকে কুমিল্লার ময়নামতিতে নগর ছিল। ২০০০ সালে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা উয়ারী-বটেশ্বর এলাকার খননকাজ শুরু করেন। আবার তৃতীয় শতকের পরে বগুড়ার মহাস্থানগড় এলাকায় নগর গড়ে ওঠে। তবে সবচেয়ে পুরানো নগরের সন্ধান পাওয়া যায় নরসিংদীর উয়ারী ও বটেশ্বর গ্রামে। ধারণা করা হয় খ্রিস্টপূর্ব ছয়-সাত শতকে সেখানে নগর গড়ে উঠেছিল। উয়ারী-বটেশ্বরে গড়ে ওঠা সভ্যতা প্রাচীনকালে সোনাগড়া নামে বিশ্বজুড়ে খ্যাত ছিল।

[প্রশ্ন-১০৬ প্রাচীন সোনাগড়া সম্পর্কে বর্ণনা দাও। (অনুধাবন)
উত্তর: উয়ারী ও বটেশ্বর নরসিংদী জেলার দুটি গ্রাম। ধারণা করা হয়, সেখানে খ্রিস্টপূর্ব ছয়-সাত শতকে নগর গড়ে ওঠে। তখন মাটির নিচে প্রাচীন দুর্গ-নগরের সন্ধান মেলে। যেখানে পাওয়া যায় ইটের স্থাপত্য, বন্দর, প্রাচীন নগরীর রাস্তা ও গলি। আরও পাওয়া যায় হাতিয়ার, পাথরের পুঁতি, পোড়ামাটির ফলক, মূল্যবান পাথর ও কাচের পুঁতি। ধারণা করা হয় এটি কোনো রাজ্যের রাজধানী ছিল। নগরটি যথার্থ পরিকল্পিত ও অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। উয়ারী-বটেশ্বরের আশেপাশে প্রায় পঞ্চাশটি পুরানো জায়গার সন্ধান পাওয়া যায়। এখানে দুর্গ-প্রাচীর, ইটের স্থাপত্য, মূদ্রা, গয়না, ধাতব বস্তু, অস্ত্র থেকে শুরু করে জীবনধারণের অনেক পুরানো উপকরণ পাওয়া গেছে। উয়ারী-বটেশ্বর ও তার আশেপাশে এই বিস্তৃত এলাকা জুড়ে গড়ে ওঠে এক সভ্যতা। সভ্যতাটি প্রাচীনকালে সোনাগড়া নামে বিশ্বজুড়ে পরিচিত ছিল। এ সভ্যতার মানুষ ব্রহ্মপুত্র নদী হয়ে সমুদ্রপথে রোমান সাম্রাজ্যের সাথে যোগাযোগ করত।

পাঠ ১৮ ইচ্ছামতী

[প্রশ্ন-১০৭ ইচ্ছামতী নদী হয়ে কবি কখন এবং কীভাবে নিজের মনের কথা দুই পারের সাথে ভাগ করে নেবেন তা আলোচনা করো। (উচ্চতর দক্ষতা)
উত্তর: ইচ্ছামতী নদী হয়ে কবি তাঁর দুই পারের সাথে নিজের মনের কথা বলতে চান। কবির ডান দিকে থাকবে সূর্য ওঠার পার। বাঁয়ের ধারে সম্ভবেলায় নেমে আসবে অন্ধকার। এই দুই পারের সাথে কথা বলার জন্য তিনি দুটি আলাদা সময় বেছে নিয়েছেন। মনের অর্ধেক কথা তিনি দুই পারের সাথে বলবেন দিনের বেলায়। আর বাকি অর্ধেক কথা তিনি বলবেন রাতে। এভাবেই কবি নিজের মনের কথা বলবেন।

[প্রশ্ন-১০৮ ইচ্ছামতী নদীর দুই ধারের পার্থক্য কী? (প্রয়োগ)

উত্তর: ইচ্ছামতী নদীর দুই ধারের পরিবেশ একে অপরের থেকে আলাদা। নদীটির ডান বা দক্ষিণ ধারে রয়েছে সূর্য ওঠার পার। আবার এই নদীর বায়ের ধারে সন্ধ্যাবেলায় অন্ধকার নেমে আসে। নদীর একধারের সবুজ রঙের মাঠ-ঘাট দেখা যায়। কিন্তু নদীর ঠিক অন্যধারে রয়েছে বালুর চর। এই বালুর চরে রোদ পড়ে চারদিক ধু ধু করতে থাকে। এভাবেই কবি ইচ্ছামতী নদীর দুই ধারের ভিন্ন রূপ বা পার্থক্য তুলে ধরেছেন।

[প্রশ্ন-১০৯ ইচ্ছামতী নদীতীরের দিন ও রাতের পরিবেশের বর্ণনা দাও।

(উচ্চতর দক্ষতা)

উত্তর: ইচ্ছামতী নদীতীরের দিন ও রাতের রূপ ভিন্ন। দিনের বেলায় ইচ্ছামতী নদীতীরে মানুষের অনেক যাওয়া-আসা থাকে। অনেক মানুষ দিনের বেলায় নদীর ঘাটে আসে, গোসল করে এবং গোরু-মহিষ নিয়ে সাঁতরে ওপারে যায়। এই সময়ে নদীর জলের উপর টুকরো আলোর রাশি ঝলমল করে ওঠে। কিন্তু রাতের বেলা নদীতীরের এই চেনা পরিবেশ সম্পূর্ণ বদলে যায়। রাতের বেলায় নদীতীরের চারপাশ একদম থমথমে হয়ে পড়ে। তখন ডাঙা বা শূকনোর দিকে তাকালে ভয়ে গা ছম ছম করে ওঠে।

[প্রশ্ন-১১০ তোমার দেখা কোনো নদীর সাথে ইচ্ছামতী নদীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তুলনা করো। (প্রয়োগ)

উত্তর: আমার দেখা একটি নদী হলো পদ্মা। ইচ্ছামতী নদীকে যদি পদ্মা নদীর সঙ্গে তুলনা করা হয়, দেখা যায় সৌন্দর্য আলাদা হলেও দুইটি নদীর সৌন্দর্যই মনোমুগ্ধকর। পদ্মা নদী বিশাল, প্রশস্ত ও প্রবাহমান, যার তীরে বন্দর, গ্রাম দেখা যায়। আর ইচ্ছামতী নদীর দুই পাশের সবুজ মাঠ আর বালুচর প্রাকৃতিক দৃশ্যকে আরও কোমল ও মনোরম করে। পদ্মার সৌন্দর্যে শক্তি ও বিশালতার ছাপ থাকে, যেখানে ইচ্ছামতীর সৌন্দর্য মনকে শান্ত করে তোলে।

পাঠ ২০ শিক্ষাগুরুর মর্যাদা

[প্রশ্ন-১১১ 'প্রাণের চেয়েও মান বড়ো'— শিক্ষকের এ কথায় কী প্রকাশ পেয়েছে? বর্ণনা করো। (অনুধাবন)

উত্তর: বাদশাহ দেখেন যে, তাঁর ছেলেকে দিয়ে শিক্ষক নিজের পায়ে জল ঢালাচ্ছেন। এ কারণে শিক্ষক প্রথমে খুব ভয় পেয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন বাদশাহ হয়তো তাঁকে শাস্তি দেবেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মনে নিজের শিক্ষক পরিচয়ের জন্য অনেক বড়ো সাহস জাগে। শিক্ষক ভাবলেন, তিনি বাদশাহের সামনে শাস্ত্রের কথা বলবেন। তাতে যদি বাদশাহ তাঁর প্রাণও নিয়ে নেন, কোনো দুষ্ট নেই। প্রাণের চেয়ে সম্মানটাই বড়ো কথা। এই কথার মাধ্যমে শিক্ষকের নিজের কাজের প্রতি গভীর সম্মান ও অসীম সাহস প্রকাশ পেয়েছে।

[প্রশ্ন-১১২ 'ধূয়ে দিলো না'ক কেন সে চরণ, স্মরি ব্যথা পাই মনে।'— বাদশাহর এমন প্রত্যাশার কারণ ব্যাখ্যা করো। (অনুধাবন)

উত্তর: বাদশাহ আলমগীর তাঁর ছেলেকে ভালো আচরণ শেখাতে চেয়েছিলেন। তিনি একদিন দেখেন যে তাঁর ছেল শূধু শিক্ষকের পায়ে জল ঢালছে। আর শিক্ষক নিজে হাত দিয়ে নিজের পায়ের ধুলো পরিষ্কার করছেন। এটি দেখে বাদশাহর মনে খুব কষ্ট হয়েছিল। শাহজাদা নিজে হাত না লাগানোয় বাদশাহর মনে হয়েছে সে গুরুজ্ঞকে অবহেলা করেছে। তিনি প্রত্যাশা করেন তাঁর সন্তান সঠিক আদব ও গুরুজনকে সম্মানের শিক্ষা পাবে। কিন্তু তা না হওয়ায় তিনি ব্যথিত হয়েছেন।

[প্রশ্ন-১১৩ শিক্ষকের মর্যাদা কেন সবার উপরে? ব্যাখ্যা করো।

(উচ্চতর দক্ষতা)

উত্তর: শিক্ষা হলো একটি জাতির মেবদণ্ড। আর শিক্ষক হলেন জাতির কাভারি এবং মানুষ গড়ার কারিগর। তিনি বাদশাহর কুমার থেকে শুরু করে সবাইকে পরম যত্নে জ্ঞান ও ভালো আচরণ শেখান। শিক্ষক তাঁর আদর্শ দ্বারা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলেন। 'শিক্ষাগুরুর মর্যাদা' কবিতায় বাদশাহ আলমগীর শিক্ষককে উপযুক্ত সম্মান দিয়েছেন। তিনি স্বীকার করেছেন শিক্ষকের পা ধূয়ে দেওয়া শাহজাদার কর্তব্য। কারণ সমাজ ও দেশের জন্য শিক্ষকের অবদান অপরিমিত। তাই হলো যায় সমাজে শিক্ষকের মর্যাদা সবার উপরে।

পাঠ ২১ বিদায় হজের ভাষণ

[প্রশ্ন-১১৪ মহানবি (স)-এর শেষ ভাষণ থেকে তোমরা কী কী শিক্ষা পাও? (অনুধাবন)

অথবা, বিদায় হজের ভাষণ থেকে তোমরা কী শিখতে পেলো? (অনুধাবন)
উত্তর: মহানবি (স)-এর শেষ ভাষণ থেকে আমরা যে উল্লেখযোগ্য শিক্ষা পাই তা নিম্নরূপ:

১. আল্লাহ প্রত্যেকের কাজের হিসাব চাইবেন।
২. গোলাম বা অধীনস্থদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে।
৩. কারো প্রতি অন্যায়-অবিচার করা যাবে না।
৪. সামান্য পাপ থেকেও নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে।
৫. অন্যের সম্পত্তি দখল করা যাবে না।
৬. ধর্মীয় ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা যাবে না। কারো উপরে তা চাপিয়ে দেওয়া যাবে না।
৭. মানুষ হিসেবে নিজেদের মর্যাদা ধরে রাখতে হবে।
৮. নারীর অধিকারকে সম্মান করতে হবে।
৯. জাতি ও ধর্ম দিয়ে কাউকে আলাদা করা যাবে না।
১০. কুরআন ও রসুলের জীবনাদর্শ অনুসরণ করতে হবে।
১১. মহানবি (স)-এর উপদেশ সবার কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

[প্রশ্ন-১১৫ মহানবি (স)-এর শেষ হজের বর্ণনা দাও। (অনুধাবন)

অথবা, মহানবি (স)-এর বিদায় হজের বর্ণনা দাও। (অনুধাবন)

উত্তর: দশম হিজরিতে আরব দেশের বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে। মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স) মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন শান্তি ও সাম্যের বাণী। ওই সময় মুহাম্মদ (স) মদিনায় বসবাস করতেন। তিনি তাঁর জন্মস্থান মক্কায় যেতে চাইলেন। এই খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। মদিনার হাজার হাজার মানুষ জড়ো হলো তাঁর কাছে। জিলকদ মাসের শেষে মহানবি সবাইকে নিয়ে মক্কায় এলেন। মক্কার লোকেরাও মহানবিকে দেখার জন্য ছুটে এলো। সেবার আরব দেশের নানা প্রান্ত থেকে প্রায় দুই লাখ মানুষ হজ পালন করতে মক্কায় এসেছিল। এত মানুষ দেখে মুহাম্মদের মন আনন্দে ভরে গেল। তিনি সমবেত মানুষের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। তাঁর জীবনে এটিই শেষ হজ।

[প্রশ্ন-১১৬ বিদায় হজের ভাষণ বলতে কী বোঝো এবং এর গুরুত্ব কী লেখো। (অনুধাবন)

উত্তর: দশম হিজরিতে মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স) মক্কায় তাঁর জীবনের শেষ হজ পালন করেন। আর এই হজে তিনি যে ভাষণ দেন তা ইতিহাসে বিদায় হজের ভাষণ নামে পরিচিত।

এই হজে আরবের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় দুই লাখ মানুষ এসেছিলেন। আরাক্ষাতের ময়দানে নবিজি (স) সবার উদ্দেশে এই ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন। এই ভাষণে তিনি মানুষের জীবন চলার সব সুন্দর নির্দেশনা দেন। তাঁর জীবনের এটিই শেষ হজ ছিল বলে এর গুরুত্ব অনেক বেশি। এই ভাষণটি মানুষের কাছে শান্তির এক মহান বার্তা। এটি মেনে চললে আমাদের জীবন ও সমাজ সুন্দর হবে।

[প্রশ্ন-১১৭ মানবজাতি চিরদিন মহানবি (স)-এর শেষ ভাষণকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করবে কেন? (অনুধাবন)

উত্তর: মহানবি (স)-এর শেষ ভাষণ অর্থাৎ বিদায় হজের ভাষণ ছিল মানবজাতির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গা দিকনির্দেশনা। এই ভাষণে তিনি মানুষের মর্যাদা ও অধিকারের কথা সহজভাবে বলেছেন। তিনি মেয়েদের অধিকার রক্ষা করতে বলেছেন। গোলাম বা কাজের লোকদের প্রতি নিষ্ঠুর হতে নিষেধ করেছেন। ধনী-গরিব এবং জাতি-ধর্মের ভেদাভেদ তুলে সবাইকে মিলেমিশে থাকার শিক্ষা দিয়েছেন। অন্যায় ও অবিচার দূর করে একটি শান্তিময় সমাজ গড়ার পথ এই ভাষণেই পাওয়া যায়। নবিজির এই মহান আদর্শ মানুষের হৃদয়ে অমর হয়ে আছে। তাই মানবজাতি চিরকাল তাঁর এই ভাষণকে শ্রদ্ধায় সজ্ঞে স্মরণ করবে।

[প্রশ্ন-১১৮ বিদায় হজের ভাষণে মহানবি (স) পরকাল এবং গোলামদের অধিকার নিয়ে কী বলেছেন? ব্যাখ্যা করো। (অনুধাবন)

উত্তর: পরকাল নিয়ে বিদায় হজের ভাষণে নবিজি (স) বলেছেন যে, একদিন আমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে হাজির হতে হবে। আমরা পৃথিবীতে যা কিছু করছি, আল্লাহ আমাদের কাছে তার সব হিসাব চাইবেন। নবিজি (স) গোলাম বা কাজের লোকদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। কারণ তারাও আল্লাহর বান্দা। আমরা নিজেরা যা খাব, তাদেরও ঠিক তাই খেতে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা যা পরব, তাদেরও সেই রকম কাপড় পরতে দিতে বলেছেন। কোনো গোলাম যদি নিজ যোগ্যতায় আমির হয়, তবে তাকে মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

[প্রশ্ন-১১৯ বিদায় হজের ভাষণে মহানবি (স) ধর্ম সম্পর্কে যা বলেছেন তা ব্যাখ্যা করো। (অনুধাবন)

উত্তর: মহানবি (স) তাঁর বিদায় হজের ভাষণে ধর্ম সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়েছেন। তিনি ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। মানুষ নিজ নিজ ধর্ম শান্তিতে এবং স্বাধীনভাবে পালন করবে। নিজের ধর্ম অন্য কারো উপর জোর করে কখনো চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। মানুষকে তিনি জাতি বা ধর্ম দিয়ে আলাদা করতে নিষেধ করেছেন। অন্য ধর্মের মানুষকে সম্মান করা এবং মিলেমিশে থাকাই হলো এই ভাষণের বড়ো শিক্ষা। তাঁর এই উপদেশ মেনে চললে সমাজে শান্তি বিরাজ করবে।

পাঠ ২২ আমরা তোমাদের ভুলব না

[প্রশ্ন-১২০ ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান সম্পর্কে যা জানো তা লেখো। (অনুধাবন)

উত্তর: বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে পাকিস্তানের শাসক ছিল আইয়ুব খান। তার অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সালে গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এ অভ্যুত্থানে ছাত্রনেতা আসাদকে খুব কাছ থেকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করে। যার স্মরণে ঢাকায় নির্মাণ করা হয়েছে আসাদ গেট। মতিয়ুর নামের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীকে রাস্তায় গুলি করে হত্যা করা হয়। শহিদ হন আনোয়ারা বেগম নামের একজন মা-ও। তিনি তখন তাঁর ঘরে সন্তানকে খাবার খাওয়াচ্ছিলেন। ক্যান্টিনমেন্টে আটকে রেখে হত্যা করা হয় সার্জেন্ট জহুরুল হককে। ছাত্রদের বাঁচাতে গিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শহিদ হন অধ্যক্ষ শামসুজ্জাহ। শহিদ হন কৃষক, শ্রমিকসহ অসংখ্য মানুষ।

[প্রশ্ন-১২১ ২১শে ফেব্রুয়ারিতে ভাষাশহিদদের অবদান সম্পর্কে লেখো। (অনুধাবন)

উত্তর: বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্র-জনতা আন্দোলন করেছিল। সেই আন্দোলনে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ নাম না জানা অনেকে শহিদ হন। মূলত বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে তাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন। তাঁদের স্মরণ করেই আমাদের শহিদ মিনার তৈরি করা হয়েছে। প্রতিবছর ২১শে ফেব্রুয়ারিতে আমরা ভাষাশহিদদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি।

[প্রশ্ন-১২২ আইয়ুব খানের নির্মমতার বর্ণনা দাও। (অনুধাবন)

উত্তর: বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে আইয়ুব খান ছিলেন পাকিস্তানের শাসক। তার অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সালে গণ-অভ্যুত্থান হয়। সে আন্দোলনে আইয়ুব খানের পুলিশ-বাহিনী হত্যা করে ছাত্রনেতা আসাদকে। হত্যা করা হয় নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী মতিয়ুরকে। ঘরের মধ্যে সন্তানকে খাবার খাওয়ানোর সময় নিহত হন আনোয়ারা বেগম। এছাড়াও আইয়ুব খানের নির্মমতার শিকার হন সার্জেন্ট জহুরুল হক, অধ্যাপক শামসুজ্জাহসহ কৃষক-শ্রমিক আর খেটে-খাওয়া অসংখ্য মানুষ।

[প্রশ্ন-১২৩ ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার পর এ দেশের মানুষকে কেন লড়াই-সংগ্রাম করতে হয়েছিল? এ সম্পর্কে যা জানো লেখো। (অনুধাবন)

উত্তর: ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও এ দেশে অনায়াস-অত্যাচার একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। ফলে এ দেশের শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে বারবার

মানুষকে লড়াই, সংগ্রাম করতে হয়েছে। শিক্ষার অধিকার রক্ষায় ১৯৮৩ সালে ছাত্রনেতা সেলিম-দেলোয়ারসহ আরও অনেকে শহিদ হন। গণতন্ত্রের দাবিতে ১৯৮৭ সালে শহিদ হন নূর হোসেন। ১৯৯০ সালে পুলিশের গুলিতে নিহত হন ডাক্তার মিলন ও জেহাদ। ২০২৪ সালে বৈষম্যের বিরুদ্ধে ও অধিকারের দাবি নিয়ে শিক্ষার্থীরা রাজপথে নামে। সরকারি বাহিনীর নির্যাতনে যা পরবর্তী সময়ে বিশাল এক গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়।

[প্রশ্ন-১২৪ ২০২৪ সালে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন কীভাবে গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নিয়েছিল? (অনুধাবন)

উত্তর: বহু আন্দোলন ও ত্যাগের পরও এ দেশের মানুষ অধিকার পায়নি, বৈষম্য কমেনি। অধিকার ও বৈষম্যের কথা বলতে গিয়ে এদেশের শিক্ষার্থীরা ২০২৪ সালে আবার রাস্তায় নামে। সরকারি বাহিনী নির্মমভাবে সেই আন্দোলন দমন করতে চেয়েছিল। দুঃশাসনের বিরুদ্ধে রংপুরে প্রতিবাদ করেন ছাত্রনেতা আবু সাঈদ। দুই হাত প্রসারিত করে তিনি পুলিশের সামনে দাঁড়ান। পুলিশ তাঁকে খুব কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করে। সারা দেশের মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। বিশাল এক গণ-অভ্যুত্থানের সৃষ্টি হয়।

[প্রশ্ন-১২৫ ২০২৪ সালে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা কেন আন্দোলন করেছিল এবং সেসময় কী হয়েছিল? (অনুধাবন)

উত্তর: অধিকার আদায় ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির লড়াই-সংগ্রামের ইতিহাস সুপ্রাচীন। বহু ত্যাগের পরও এ দেশের মানুষ পূর্ণ অধিকার পায়নি, তাদের সাথে বৈষম্য কমেনি। তাই অধিকারের দাবি ও বৈষম্যের নিরসনের জন্য শিক্ষার্থীরা ২০২৪ সালে রাস্তায় নামে। সেসময় সরকার নির্মমভাবে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন দমন করতে চায়। তখন পুলিশের গুলিতে শহিদ হন আবু সাঈদ, মীর মুশ্ব ও ওয়াসিম আকরাম। এর ফলে আন্দোলন সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। নিহত হন আরও অনেকে।

পাঠ ২৩ পোস্টার লিখি, প্ল্যাকার্ড লিখি

[প্রশ্ন-১২৬ মিতুর মন খারাপ হয়েছিল কেন? (অনুধাবন)

উত্তর: স্কুলে যাওয়ার পথে একটি ঘটনা ঘটে যার কারণে মিতুর মন খারাপ হয়ে যায়। স্কুলে আসার পথে মিতু দেখে একটা গাছ কেটে রাস্তার পাশে ফেলে রাখা হয়েছে। সেই গাছের ডালে একটা পাখির বাসা ছিল। গাছ কাটার সাথে বাসাটাও ভেঙে গেছে। সেখানে ডিম বা ছানা থাকতে পারে। তখন পাখিদের কবুণ অবস্থার কথা ভাবতে ভাবতে মিতুর মন খারাপ হয়ে যায়।

[প্রশ্ন-১২৭ 'পাখিদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ খুবই দরকার।'— ব্যাখ্যা করো। (অনুধাবন)

অথবা, পাখিদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ গড়তে তোমাদের এক সাথে কাজ করতে হবে কেন? (অনুধাবন)

উত্তর: পাখি আমাদের পরিবেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রাণী। পোকামাকড় খেয়ে ভলো ফসল ফলাতে সাহায্য করে ছোট পাখিরা। পাখিদের টিকে থাকার জন্য নিরাপদ পরিবেশ খুব দরকার। কেননা তারা গাছে, দালানে কিংবা নদীর ধারে বাসা বানায়। সেখানে ডিম পাড়ে ও ছানাদের বড়ো করে। যদি গাছ কাটা হয় বা পরিবেশ বিপন্ন হয়, তবে পাখিরা নিরাপদে থাকতে পারবে না। তাই তাদের বাঁচার জন্য নিরাপদ পরিবেশ খুবই প্রয়োজন।

[প্রশ্ন-১২৮ পোস্টার তৈরির উপকরণ কী কী এবং এর কাজ কী? ব্যাখ্যা করো। (অনুধাবন)

উত্তর: পোস্টার সাধারণত বড়ো দেয়াল বা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় মারা হয়। পোস্টার বানাতে দরকার হয় বড়ো কাগজ, লেখার জন্য রং-তুলি বা মার্কার কলম। তারপর সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে টাঙানো হয়। পোস্টারের কাজ হলো মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পৌঁছে দেওয়া। এতে করে মানুষের মাঝে সচেতনতা তৈরি হয়।

প্রশ্ন-১২৯ প্র্যাকার্ড তৈরির উপকরণ কী কী এবং এর কাজ কী? ব্যাখ্যা করো। (অনুধাবন)

উত্তর: প্র্যাকার্ড বানাতে লাগে মোটা শক্ত বড়ো কাগজ আর লেখার জন্য রং-তুলি বা মার্কার কলম। আর এটি ধরার জন্য কাগজের নিচে কখনো কখনো বাঁশ বা কাঠের ফালি ব্যবহার করা হয়। প্র্যাকার্ডের কাজ মূলত জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা। বিভিন্ন মিছিল, সভা, স্কুলের প্রদর্শনী বা প্রচারণায় প্র্যাকার্ড কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এটির মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও সচেতনতামূলক তথ্য প্রচার করা হয়।

প্রশ্ন-১৩০ পাখি রক্ষায় আমরা কী কী করতে পারি? (অনুধাবন)

উত্তর: পরিবেশের জন্য পাখি উপকারী। তাই পাখি রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। পাখির গাছে বাসা বেঁধে বাস করে। তাই আমরা গাছ রক্ষায় মনোযোগ দিতে পারি। আবার কোনো কোনো পাখি দালান বা ঘরে বাসা বানায়। অনেক পাখি নদীর তীরেও বাসা বানায়। পাখিদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ খুবই দরকার। এ বিষয়ে সবাইকে সচেতন হতে হবে। এই কাজটি আমরা একসাথে করতে পারি। যেমন— পোস্টার লিখে দরকারি কথা মানুষকে জানাতে পারি। প্র্যাকার্ড লিখেও মানুষকে জানাতে পারি।



সুপার সাজেশন

পরীক্ষার জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন— ৮, ১৭, ২৪, ৩৩, ৪২, ৫২, ৬০, ৭২, ৮৬, ৮৮, ১০১, ১০৯, ১১৯, ১২১



নিজেকে যাচাই করি: বিস্তৃত-উত্তর প্রশ্ন

বৃত্তি পরীক্ষায় সাফল্য নিশ্চিত করতে হলে প্রতিটি প্রশ্নের ধরনে পূর্ণ নম্বর পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। প্রশ্নের ধরন ৮-এ তোমার প্রভুতি কেমন হলো তা যাচাইয়ের জন্য এখানে বিভিন্ন অধ্যায়ের সমন্বয়ে ১০ সেট প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। তুমি নিজে নিজে পরীক্ষা দিয়ে 'উত্তরমালা'র সঙ্গে মিলিয়ে দেখো। যদি সবগুলোর উত্তর সঠিক না হয় তাহলে পূর্বের অংশটি পুনরায় অনুশীলন করো।

সেট ১ নিচের প্রশ্নগুলোর বিস্তৃত উত্তর লেখো: $৫ \times ৩ = ১৫$

- বৈচিত্র্য কীভাবে বাংলাদেশকে সুন্দর করেছে?
- 'সাইক্লোন' কবিতা অনুসারে ঘূর্ণিঝড়ের ভয়াবহতা নিরূপণ করো।
- 'বকুল ডালে লুকিয়ে থেকে/ পাখির মতো ডাকতে।'— কবির এমন ইচ্ছা জাগার কারণ কী?

সেট ২ নিচের প্রশ্নগুলোর বিস্তৃত উত্তর লেখো: $৫ \times ৩ = ১৫$

- 'রাখাল ছেলে' কবিতায় বর্ণিত গ্রামীণ প্রকৃতির রূপের বিবরণ দাও।
- ইচ্ছামতী নদীর দুই ধারের পার্থক্য কী?
- মহানবি (স)–এর শেষ ভাষণ থেকে তোমরা কী কী শিক্ষা পাও?

সেট ৩ নিচের প্রশ্নগুলোর বিস্তৃত উত্তর লেখো: $৫ \times ৩ = ১৫$

- কুটির শিল্পকে কেন কুটির শিল্প বলা হয়? এ শিল্পের কয়েকটি উদাহরণ দাও?
- মানুষ কেন দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটছে? বর্ণনা করো।
- শিক্ষকের মর্যাদা কেন সবার উপরে? ব্যাখ্যা করো।

সেট ৪ নিচের প্রশ্নগুলোর বিস্তৃত উত্তর লেখো: $৫ \times ৩ = ১৫$

- 'দূরের পাল্লা' কবিতায় ফুটে ওঠা নদীতীরস্থ প্রাকৃতিক পরিবেশের সৌন্দর্য বর্ণনা করো।
- কীভাবে উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাচীন সভ্যতার রোজ পাওয়া যায়?
- ইচ্ছামতী নদীতীরের দিন ও রাতের পরিবেশের বর্ণনা দাও।

সেট ৫ নিচের প্রশ্নগুলোর বিস্তৃত উত্তর লেখো: $৫ \times ৩ = ১৫$

- রয়েল বেঙ্গল টাইগারের পরিচয় দাও।
- রাখাল ছেলের সাথে প্রকৃতির বন্ধুত্বের পরিচয় দাও।
- পাচজন শহিদ বুদ্ধিজীবীর নাম লেখো।

সেট ৬ নিচের প্রশ্নগুলোর বিস্তৃত উত্তর লেখো: $৫ \times ৩ = ১৫$

- বাংলাদেশ সমৃদ্ধ হওয়ার পিছনে কাদের অবদান রয়েছে?

- রয়েল বেঙ্গল টাইগার চিরতরে হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে হবে কেন?

- কবির সংকল্প কী এবং তিনি তা কীভাবে পূরণ করবেন? আলোচনা করো।

সেট ৭ নিচের প্রশ্নগুলোর বিস্তৃত উত্তর লেখো: $৫ \times ৩ = ১৫$

- সুখুর পরিণতি কী হয়? বর্ণনা করো।
- 'প্রাণের চেয়েও মান বড়ো'— শিক্ষকের এ কথা কী প্রকাশ পেয়েছে? বর্ণনা করো।
- পোস্টার তৈরির উপকরণ কী কী এবং এর কাজ কী? ব্যাখ্যা করো।

সেট ৮ নিচের প্রশ্নগুলোর বিস্তৃত উত্তর লেখো: $৫ \times ৩ = ১৫$

- 'দূরের পাল্লা' কবিতায় নৌকায় যেতে যেতে মাঝিরা কী কী দেখছে?
- শেয়াল কেন বাঘের সঙ্গে আপস-রফা করেছিল? বর্ণনা করো।
- ২০২৪ সালে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা কেন আন্দোলন করেছিল এবং সেসময় কী হয়েছিল?

সেট ৯ নিচের প্রশ্নগুলোর বিস্তৃত উত্তর লেখো: $৫ \times ৩ = ১৫$

- 'সাইক্লোন' কবিতায় হারান মাঝি ও পরান শেখের ডাকাডাকিতে কী প্রকাশ পায়?
- 'ঠিক আছে' কবিতায় লোকটি কেন মেহমানকে সংসারের ঝামেলার দিকগুলো বুঝিয়েছেন? বর্ণনা করো।
- বিদায় হজের ভাষণে মহানবি (স) ধর্ম সম্পর্কে যা বলেছেন তা ব্যাখ্যা করো।

সেট ১০ নিচের প্রশ্নগুলোর বিস্তৃত উত্তর লেখো: $৫ \times ৩ = ১৫$

- 'পাঠে আমার মন বসে না/ কাঁঠালটাপার গন্ধে।'— এই চরণের আলোকে কবির পড়ায় মন না বসার কারণ বুঝিয়ে লেখো।
- টুকটুকের মতো তুমি কীভাবে পশুপাখির যত্ন নিবে? বর্ণনা করো।
- কুটির শিল্পের উপকরণ সম্পর্কে আলোচনা করো।

উত্তরমালা: নিজেকে যাচাই করি

সেট ১ ক. পৃষ্ঠা ৬১ প্রশ্ন নম্বর ৮। খ. পৃষ্ঠা ৬৪ প্রশ্ন নম্বর ৩৫।
গ. পৃষ্ঠা ৬৭ প্রশ্ন নম্বর ৭৪।

সেট ২ ক. পৃষ্ঠা ৬৫ প্রশ্ন নম্বর ৫১। খ. পৃষ্ঠা ৭১ প্রশ্ন নম্বর ১০৮।
গ. পৃষ্ঠা ৭১ প্রশ্ন নম্বর ১১৪।

সেট ৩ ক. পৃষ্ঠা ৬৬ প্রশ্ন নম্বর ৫৮। খ. পৃষ্ঠা ৬৯ প্রশ্ন নম্বর ৮৮।
গ. পৃষ্ঠা ৭১ প্রশ্ন নম্বর ১১৩।

সেট ৪ ক. পৃষ্ঠা ৬২ প্রশ্ন নম্বর ১৭। খ. পৃষ্ঠা ৭০ প্রশ্ন নম্বর ১০২।
গ. পৃষ্ঠা ৭১ প্রশ্ন নম্বর ১০৯।

সেট ৫ ক. পৃষ্ঠা ৬৪ প্রশ্ন নম্বর ৩৮। খ. পৃষ্ঠা ৬৫ প্রশ্ন নম্বর ৫৫।
গ. পৃষ্ঠা ৭০ প্রশ্ন নম্বর ৯৯।

সেট ৬ ক. পৃষ্ঠা ৬১ প্রশ্ন নম্বর ৬। খ. পৃষ্ঠা ৬৪ প্রশ্ন নম্বর ৪১।
গ. পৃষ্ঠা ৬৯ প্রশ্ন নম্বর ৯২।

সেট ৭ ক. পৃষ্ঠা ৬৩ প্রশ্ন নম্বর ৩৩। খ. পৃষ্ঠা ৭১ প্রশ্ন নম্বর ১১১।
গ. পৃষ্ঠা ৭২ প্রশ্ন নম্বর ১১৮।

সেট ৮ ক. পৃষ্ঠা ৬২ প্রশ্ন নম্বর ১৮। খ. পৃষ্ঠা ৬৮ প্রশ্ন নম্বর ৮০।
গ. পৃষ্ঠা ৭২ প্রশ্ন নম্বর ১২৫।

সেট ৯ ক. পৃষ্ঠা ৬৪ প্রশ্ন নম্বর ৩৬। খ. পৃষ্ঠা ৬৩ প্রশ্ন নম্বর ২২।
গ. পৃষ্ঠা ৭২ প্রশ্ন নম্বর ১১৯।

সেট ১০ ক. পৃষ্ঠা ৬৭ প্রশ্ন নম্বর ৭৩। খ. পৃষ্ঠা ৬৫ প্রশ্ন নম্বর ৫০।
গ. পৃষ্ঠা ৬৬ প্রশ্ন নম্বর ৬০।